পুরাতনী

(মুস্লিম নারী-চিত্র)

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পাঁচসিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

এই সামাজিক দুর্দ্দিনে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মধ্যে বাস করিয়াও যাঁহারা বিচার-বুদ্ধি হারান নাই, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সার্ব্বভৌম প্রীতি ও জগতের কল্যাণ-সাধনই যাঁহাদের লক্ষ্য—সেই মহামনা উদার-চিত্ত নরনারীদের হস্তে এই পুস্তকখানি সাদরে অর্পণ করিলাম।

বাঙ্গলাদেশের হিন্দু-মুসলমান—এই উভয় শ্রেণীর দীনতম কুটিরেও আত্মত্যাগ ও প্রীতির যে অব্যর্থ উচ্চ আদর্শ এত দিন ধরিয়া সমাজে প্রেরণা দিয়াছে, যাহার ফলে এ-দেশের নেংটি-পরা কৃষকও উচ্চ চিন্তায় কাহারও কাছে মাথা হেঁট করে নাই—' আশা করি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিলে পাঠক তাহার আভাস পাইবেন—তাহা হইলেই আমার চেষ্টা সার্থক বোধ করিব।

বেহালা, ২৪শ পরগণা
১৭ই জুন, ১৯৩৯

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ভূমিকা

এই চিত্রগুলি অন্যূন দুই শত বৎসরের প্রাচীন, অনেকাংশে সত্য ঘটনা-মূলক বাঙ্গালী রমণীর কাহিনী।

বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে কুটিরে কুটিরে যে সকল রত্ন-মাণিক্য লুক্কায়িত আছে, এক অশিক্ষিত রোগজীর্ণ পীড়িত যুবক প্রায় ত্রিশবর্ষ পূর্ব্বে আমাকে তাহার সন্ধান দিয়াছিলেন; আমার মনে মনে এই পল্লী-সম্পদের লালসা পূর্ব্ব হইতেই জাগিয়াছিল; তাহা কিরূপে হইয়াছিল, তাহা আমি এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই; হয়ত গঙ্গা, পদ্মা, ভৈরব, ধন্থ, কংস, ফুলেশ্বরী, ধলেশ্বরী, শীতলাক্ষা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদীর সুনির্ম্মল জল-রাশি আমাকে বঙ্গের উদার বৈভবের স্বপ্ন দেখাইয়াছিল; বঙ্গের মাতা ও ভগিনীদের সর্ব্বস্ব-দেওয়া ভালবাসা হয়ত আমাকে বঙ্গের স্বরূপ চিনাইয়াছিল; কিম্বা এ দেশের মালঞ্চের অতসী-কুন্দ চামেলী-চম্পক-যথি-জাতির রূপ-মহিমা ও সৌরভ, পল্লী-সম্পদের আভাস দেখাইয়া প্রতিদিন আমাকে প্রভাতে উদ্বোধন করিত। এই দেশের শ্যামা প্রকৃতির স্নিগ্ধ উজ্জ্বল বর্ণ আমার চক্ষে যে কত ভাল লাগিত—তাহা আর কি বলিব? লুপ্ত পিতৃ-সম্পদের আশা-লুব্ধ ব্যক্তি যেরূপ উদভ্রান্ত ভাবে তাহার ভিটার আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়—এই বঙ্গভূমির লুপ্ত-রত্নের খোঁজে আমার মন তেমনই উতলা হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইত। একদিন যে খোঁজ দিয়াছিল, বাঙ্গালী বৈষ্ণবের

খোলের শব্দ ও মনোহরসাহী রাগিনী। চন্দ্রোদয়ে নদীর তরঙ্গ যেরূপ আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে, মনোহরসায়ী, রেনেটি, গড়ণহাটী ও মান্দারনীর বিচিত্র সুরে—বাঙ্গালার কীর্ত্তন আমাকে এক অব্যক্ত অপরূপ সুর-মহিমার আভাস দিয়াছিল; আর একদিন আমার বাড়ীর পূর্ব্বে যে বিরাট দীঘিটি আছে তাহার উত্তর পার হইতে শ্বেতশ্মশ্রু, সৌম্য দর্শন একজন মুসলমানের প্রভাতী আজানের সুরে আমার হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল তুলিয়াছিল। কি মিষ্ট সেই সুর, তাহা যেন আল্লাকে বুকের ভিতর পাইয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল,—কোকিলের কণ্ঠস্বর ও উষায় বনচর পাখীগুলির সুর—সেই আজানের সুরের নিকট পরাজয় মানিয়াছিল। আমার বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে,—সে দেশে প্রতিনিয়ত পদ্মা ও ধলেশ্বরীর ঢেউএর সঙ্গে তান রাখিয়া যখন মাঝিরা ভাটিয়াল গান গাইত ও শস্যশ্যামল ক্ষেত্র হইতে সকরুণ ভাটিয়াল সুর—একটা প্রাণের নিবেদন লইয়া সমস্ত নীলাকাশ ও নদীতরঙ্গ পরিপ্লাবিত করিত—তখন মনে হইত আমি বঙ্গদেশের হারাণো মাণিক খুঁজিয়া পাইয়াছি, কে জানে কি আনন্দে আমার গণ্ড বাহিয়া আনন্দাশ্রু পড়িত! আমার মনে হইত বাঙ্গালা দেশের এই রূপ-সাগরে জন্ম লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।

আমার মনের এই আন্তরিক দরদ ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল যেদিন চন্দ্রকুমার আমাকে পল্লী-গীতিকাগুলির খবর দিলেন। আমার মনে হইল আমি বুঝি ইহারই জন্য এতদিন বাঁচিয়াছিলাম। তারপর আসিলেন আশু চৌধুরী ও বিহারী চক্রবর্ত্তী, ইহাদের সংগৃহীত পল্লী-গীতিকাগুলি আমাকে যে আনন্দ দিয়াছিল, তাহা আমি বঙ্কিম,

নবীনের লেখায় পাই নাই—আমার স্ত্রী-পুত্র কন্যা ভগিনী আমাকে যে আনন্দ দিয়াছেন, তাঁহাদের স্নেহ-সারে অভিষিক্ত হৃদয়ের আকর্ষণ অপেক্ষা মলুয়া, মহুয়া, রাণী কমলা, কাঞ্চনরেখা, নুরন্নেহা, মদিনা ও আয়না আমাকে অল্প আনন্দ দেয় নাই। আমার মনে হইয়াছে ইহারা আমার স্বগণ, ইহাদের কাহারো আঁচলে হিন্দুর ছাপ মারা—কাহারো ওড়নায় মুসলমানের ছাপ আছে, কিন্তু সেগুলি একান্ত বাহ্য। আমি দেখিলাম যে-পরিমাণে ইঁহারা হিন্দু বা মুসলমান, তাহা অপেক্ষা সমধিক পরিমাণে ইহারা বাঙ্গালী। এই গীতিকাগুলি যাদুকরীর কবচের ন্যায় স্বগণদিগের সঙ্গে স্নেহের ডুরি বাঁধিয়া আমার অন্তরের সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিল। দেখিলাম,—বেহুলা, ফুল্লরা মলুয়া যে উপাদানে গড়া—আমিনা, ভেলুয়া, মদিনাও সেই একই উপাদানে গড়া। তাহাদের চরিত্রের মাধুরী, জীবনের পবিত্রতা—সর্ব্বস্ব দেওয়া ভালবাসা, অপার সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ—বাঙ্গালার বহু শত বৎসরের সাধনাকে যেন রমণীমূর্ত্তি উপলক্ষ করিয়া স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছে। এই গীতিকাগুলি বুঝাইল, আমরা এক জাতি ও এক পরিবার-ভুক্ত, হিন্দু মুসলমানের বিরোধাগ্নি আমার চক্ষের জলে নিভিয়া গেল। ইহারা আমার দেশের খাঁটি আদর্শ, বাঙ্গালার খাঁটি উপাদানে গড়া, ইহাদিগকে লইয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে আমাদের সকলেরই আছে।

এই পল্লী-সাহিত্য আমাকে শিখাইল, সংস্কৃতের আভিধানিক আড়ম্বর, অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধান ও বড় বড় সমাস-সন্ধি ও ছন্দের ঝঙ্কার খাঁটী বাঙ্গালা নহে। তখন মনে হইল, কালিদাসের "কিমপিহি মধুরানাং মণ্ডনং ন কৃতিনাং"। হীরাকে গিল্টী করিতে কে যায়?

সোনাকে কে সাজাইতে চায়? ফুলকে কে আতর দিয়া সুবাসিত করিতে ইচ্ছুক? আমি যে কয়েকটি গল্প এখানে সংক্ষেপে দিলাম, তাহা যদি কেহ আদত পল্লী-গীতিকাগুলির কাছে রাখিয়া মূল্য নির্দ্ধারণের প্রয়াস পান, তবে আপনারা বুঝিবেন—আমি কত দরিদ্র, কত কৃত্রিম ও অল্প-দরের লেখক! আমার লেখা সং[illegible] ছন্দে, বাহিরের চাকচিক্য দ্বারা পাঠককে ভুলাইতে ব্যস্ত, [illegible]হা বাক্-পল্লবেপূর্ণ, অসার শব্দচ্ছটার ময়ূরপুচ্ছ পরিয়া দরবা[illegible]ল্য দিয়া ভদ্রতা রক্ষা করিতেছে মাত্র। কিন্তু সেই সকল নিরক্ষ[illegible]ক কবি নিতান্ত সরল,—একান্তভাবে অনাড়ম্বর; তাহাদের কথা [illegible] হইতে উঠে না, উঠে হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে। তাহাদের [illegible] মধ্যে প্রাণের প্রেরণা আছে; তাহা জীবন্ত ও মায়ের ডাকের মত স্নেহ-মধুতে ভরপূর; সেই ভাষা ছেলেরা মায়ের কাছে পাইয়াছে, ভাই ভায়ের কাছে ও ভগিনী ভগিনীর কাছে পাইয়াছে,—তাহা একেবারে সোজাসুজি মানুষের মন হইতে আসিয়াছে এজন্য "ভাদ্র মাসের চাম্নি যেমন দেখায় নদীর তলা" তেমনই এই কথা-কাব্যের প্রত্যেকটি শব্দ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশকে দেখাইয়া দেয়। পণ্ডিতী বাঙ্গালার সঙ্গে এই কথা-সাহিত্যের তুলনাই হয় না অনেক সময় শিক্ষিত লেখকের কথাগুলি সম্বন্ধে হ্যামলেটের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—"words, words, words"—কেবলই দরদহীন কতকগুলি শব্দ-সমষ্টি মাত্র।

যে সকল নারীচিত্র এই সকল গল্পে দিয়াছি তাহার প্রায় সকলগুলিই ২।৩ শত বৎসরের প্রাচীন, এই পল্লী-সাহিত্যে প্রাচীনতর গীতিকা অনেক আছে। ইহাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

নাই—এ কথা বলা যায় না। বিজ্ঞান অমিত-তেজা সূর্য্যের ন্যায়; তাহা ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জিনিষই সুস্পষ্টভাবে যথাযথ রূপে দেখাইয়া দেয়। বিজ্ঞানপন্থী ইতিহাস বাস্তব ঘটনাগুলির স্বরূপ প্রকট করে। কিন্তু এই সকল গল্প ঐতিহাসিক ভিত্তিহীন ইহা না বলা গেলেও, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, বাস্তব চিত্রের উপর ইহারা যেন চাঁদিনী রাত্রের জ্যোৎস্নার জাল বুনিয়া দিয়াছে—তাহাতে পার্থিব ঘটনাগুলি আরো বেশী হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহারা সত্যকে কল্পনার আলোকে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইতেছে। এই গল্প গুলিতে ইতিহাসের যথেষ্ট উপকরণ আছে; কিন্তু ইহাদিগকে ইতিহাস বলা চলে না, ইহারা ইতিহাসের ছদ্মবেশে কাব্য। বাঙ্গালা অলঙ্কার-শাস্ত্রের ভাষা এবং এই কথা-সাহিত্যের ভাষার পার্থক্য দেখাইবার জন্য একটি উদাহরণ দিব। কাশীদাস অর্জ্জুনের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা অনেকে তাহার কবিত্ব দেখাইতে যাইয়া উৎসাহের সুরে আবৃত্তি করেন :—

"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্ম-নেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা
মুখ রুচি, কত শুচি করিতেছে শোভা।
ভুজ যুগে নিন্দে নাগে ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥"

বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রচনা হিসাবে উদ্ধৃত ছত্রগুলি প্রশংসনীয়। কিন্তু এই ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের মধ্যে যাহাকে পাইলাম, তিনি

কি জীবন্ত কোন বীরবর? উপেক্ষা ও উৎপ্রেক্ষার আবছাবা-ঢাকা একটি মূর্ত্তি দেখিলাম সত্য, তাহা শব্দের ঐশ্বর্য্যে গৌরবান্বিত, কিন্তু কোন জীবন্ত মানুষ নহে।

তৎস্থলে পল্লীর নিরক্ষর কবির আঁকা একটি গ্রাম্য কৃষকের এই ছবি দেখুন,—

"মালেক তাহার নাম দেওগাঁয় বাড়ী,
সোমস্ত জোয়ান মর্দ্দ মুখে চাপ দাঁড়ি।
বাহুতে রূপার তাবিজ বাঁধা রেসম দিয়া
বয়স উতরি গেল, না হইল বিয়া॥"

এখানে পল্লী কবি যাহাকে দেখাইলেন, তাহা এত স্পষ্ট যে মনে হয়, তাহার দেহে সূঁচ বিঁধাইলে তাহা হইতে রক্ত পড়িবে। অথচ কত অনাড়ম্বর এই বর্ণনা, কত সহজ ও সংক্ষিপ্ত!

মার্জ্জিত, সংস্কৃত বা অন্য কোন ভাষার পরিচ্ছদ-পরা সাহিত্য, এবং সহজ—সুন্দর সরল প্রাণের উক্তি সম্বলিত গীতির পার্থক্য এখানে। নিরক্ষর কবি যেখানে যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা যেন তাহার চোখের দেখা; পাণ্ডিত্যের নীলচশমা পরিয়া তিনি দৃশ্যগুলি দেখেন নাই। "রংদিয়ার চরে" মৎস্যের কারবারের বর্ণনা, হার্ম্মানদের অত্যাচার, ঝড়ের সময় কালাপানি ও পাঁচগেরার ভীষণ ছবি,—এ সকল যেন কবি আমাদের চোখের সামনে দাঁড় করাইয়াছেন; আমাদের লেখায় সেই অকপট নিতান্ত অকৃত্রিম সাহিত্যের ছায়াটুকু দেওয়াও একরূপ অসম্ভব, যেহেতু আমরা যে সকল পরিবেষ্টনীর মধ্যে আছি, তাহাতে ভাষা নিজের সরল ঋজু

পথ ছাড়িয়া পাণ্ডিত্যের বক্র-গতি অবলম্বন করিয়াছে। ভাবগুলি প্রাকৃতিক সারল্য ও কবিত্ব-পূর্ণ সহজ-সুন্দর পথ ছাড়িয়া নানা জটিল পথে রওনা হইয়াছে। সহজ ও সুন্দরকে বর্ব্বরতা বলিয়া—উড়াইয়া দিয়া জটিল ও অস্বাভাবিক বক্রোক্তি ও সংস্কৃত-মূলক নবাগত কথাসমূহকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। মোট কথায় ভাষায় উভয়তঃ আধুনিক সাহিত্য ক্রমাগত একটা তাল পাকাইয়া তুলিযাছে। এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে গীতি-কথার সার ভাব ও সঙ্কলন বর্ত্তমান সাহিত্যিক ভাষায় করা সহজসাধ্য নহে। তথাপি যদি কোন পাঠক এই সংক্ষিপ্ত গল্পগুলি পাঠ করিয়া মূল গীতিকাগুলি পড়িবার কৌতূহল অনুভব করেন, তবেই এই পুস্তক-খানির অভীষ্ট সার্থক হইবে।

এখানে আলঙ্কারিক ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন আমার অভিপ্রেত নহে; অলঙ্কার অনেক সময়ে স্বভাবের শোভাবর্দ্ধন করে, কিন্তু তাহার মধ্যে যে কৃত্রিমতা প্রবেশ করে, তাহা কতক পরিমাণে মৌলিক সৌন্দর্য্যের হানিকর।

পল্লীগীতিকাগুলি উদ্ধার করিবার পরে আমার যে আনন্দ ও বিস্ময় হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এ যেন ঘবা পয়সাটা খুঁজিতে যাইয়া গৃহের একটা অবজ্ঞাত ক্ষুদ্র গর্ত্তে পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত কলসী-ভরা মোহর ও জহরৎ লাভ করিয়াছি। আমার মনের ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়াছি—বহু নদ-নদী কান্তারের পরপারে স্থিত সুদূর পাশ্চাত্য দেশ হইতে। বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকরী এ্যাণ্ড্রি কারপেলিস গীতিকাগুলির সংকৃত ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া লিখিলেন, "আমি বিশ বৎসর যাবৎ ভারতীয় সাহিত্য পাঠ

করিতেছি, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে যে এমন চমৎকার ও দুর্লভ জিনিষ আসিয়া আমার হাতে পড়িবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই"—"গীতিকা-গুলি জগতের সাহিত্যের প্রথম পংক্তিতে স্থান পাইবে—এবং বিস্ময়াবিষ্ট পাঠক যুগে যুগে ইহাদের নব নব সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিবেন···এই গীতিগুলির নায়িকারা সেক্ষপীয়র ও রেসমীর নায়িকাদের মত য়ুরোপের ঘরে ঘরে পঠিত ও আদৃত হওয়ার যোগ্য।" ডাঃ সিলভান লেভি লিখিলেন—"এই শীতপ্রধান রাজ্যে বাস করিয়া মহুয়া গল্পে যেন সৌরকরোজ্জল সুন্দর প্রাচ্য দৃশ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইল—প্রাণবন্ত নায়ক নায়িকার অভিযান যেন ভারতীয় বসন্ত ঋতুর খেলা আমাকে দেখাইয়া মুগ্ধ করিল।" মণিষী অধ্যাপক ডাঃ ষ্টেলা ক্র্যামরিশ লিখিলেন, "আমি ভারতীয় সমস্ত সাহিত্যে মহুয়া গল্পের জোড়া পাই নাই। আমি তিনদিন জ্বরে পড়িয়াছিলাম, সেই জ্বরের ঘোরে সদাসর্ব্বদা কেবল মহুয়া, নদের চাঁদ, হুমড়া বেদে ও পালঙ্ক-সখীকে দেখিয়াছি।" য়ুরোপের অন্যতম প্রধান চিত্রশিল্পী রদেনষ্টাইন লিখিলেন "অজন্তা, বাগ প্রভৃতি স্থানে যে সকল মহিয়সী মহিলার চিত্র দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া-ছিলাম, বাঙ্গালা পল্লী-গানের নায়িকারা যেন তাহাদিগের জীবন্ত রূপ আমাকে দেখাইয়াছে।"—কলিকাতা শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ওটেন সাহেব একটি প্রসিদ্ধ পত্রিকায় লিখিলেন; "যন্ত্রোৎপাদিত ধূম্রপূর্ণ আকাশ ও ধূলি বালুতে পূর্ণ সহরের অপরিচ্ছন্ন মলিন বায়ুস্তর ছাড়িয়া যেন পূর্ব্ববঙ্গের বিশাল নদ-নদীতে আসিয়া পড়িলাম। বর্ত্তমান কৃত্রিম সাহিত্য পাঠ করার পর পল্লী-সাহিত্যের এই সহজ সুনির্ম্মল রূপ তেমনই সুখপ্রদ ও স্বাস্থ্যকর মনে হইল।"

আমেরিকার সমালোচক এলেন সাহেব লিখিলেন, "বাঙ্গালী যদিও অতি প্রাচীন জাতি তথাপি তাহার দুঃবোঙ্গনোচিত উৎসাহ ও হৃদয়ের আবেগ পাশ্চাত্য জাতিদের মতই, তাহারা এখনও পূর্ণ-মাত্রায় প্রাণবন্ত, এই গীতিকাগুলি পড়িয়া আমি বাঙ্গালীদের সঙ্গে আমার অন্তরের জ্ঞাতিত্ব বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিলাম।"

লাট রোনাল্ডসে মহোদয়কে একটি ছত্রে তাঁহার অভিমত জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি একটি নাতিক্ষুদ্র ভূমিকায়—এই গীতিকাগুলির প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "জাতীয় চরিত্র ও মনোভাব বুঝিবার পক্ষে এই গীতিগুলি একান্ত প্রয়োজনীয়, ভারতের প্রত্যেক শাসনকর্ত্তার এগুলি পাঠ করা উচিত।"

কবি জসিমুদ্দিন এত সুন্দর গানগুলি খাঁটি কিনা এজন্য প্রথমত একটা দ্বিধাযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে নিজে পল্লীতে ঘুরিয়া অনেক গান নিজে শুনিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন "আমার পূর্ব্বে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহাই আমার দোষ। আর এখন যে আমি এ গান শুনিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া আসিয়াছি, তাহা কি কেহ দেখিবে না? গীতিকার মত গান রবীন্দ্রনাথও রচনা করিয়া গৌরব করিতে পারেন। সন্দেহ না করিলে সত্যকে পাওয়া যায় না। স্বয়ং মহাপ্রভুকে অদ্বৈতের মত জ্ঞানবান ব্যক্তি সন্দেহ করিয়া নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন"। ডাঃ সহিদুল্লা ইহাদের সম্বন্ধে ময়মনসিংহের এক সাহিত্যিক সভায় সভাপতি স্বরূপ যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মনে হইল—ডাক্তার সাহেব অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু পল্লী-জীবনের মাধুর্য্য পূর্ণ রস-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার নাড়ীচ্ছেদ হয় নাই।

আমার একটা বড় আলমারী এই গীতিকাগুলি সম্বন্ধে খুব দরদের সঙ্গে লেখা উচ্চ প্রশংসাযুক্ত মন্তব্যে পূর্ণ। জার্ম্মানি, ইতালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি নানা দেশের মনস্বী লেখকেরা যেরূপ উচ্চ কণ্ঠে ইহাদের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা সাধারণ মন্তব্যের পংক্তি-ভুক্ত নহে, অসামান্য সহৃদয়তার পরিচায়ক।

এই গীতিকাগুলির সুরের একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও আমার লেখা জাগাইতে পারিবে না—এই আশঙ্কা আমার আছে এবং তাহাই আমার মনের প্রধান দুঃখ। এই পুস্তকে ছয়টি গল্প দেওয়া হইল।

দুলাল ও মদিনা গল্পে এক কৃষক ও তাঁহার পত্নী ক্ষেতের কাজের উপলক্ষে যে প্রগাঢ় দাম্পত্যে আবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহার কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে, প্রতি খুঁটি-নাটি গার্হস্থ্য কর্ম্মের অন্তরালে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ একটি বাসন্তী লতার মত কিরূপে বাড়িয়া চলিয়াছিল, তাহা বিশ্লেষণ করিলে মানুষের মনস্তত্ত্বের একটি বিশেষ স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্পের শেষদিকের কারুণ্যপূর্ণ বর্ণনা বঙ্গোপসাগরের একটা প্লাবনের মত, তাহা এ দেশের আশ্বিনিয়া বন্যার মত, যেন মানুষের ঘরবাড়ী ভাসাইয়া লইয়া যায়। গল্পের প্রথম দিকটা কতকটা রূপ-কথার মত, কিন্তু শেষ দিকটা পরবর্ত্তী যুগের আন্তরিকতাপূর্ণ রচনা।

ভেলুয়া—ইহার ভিত্তি সত্য ঘটনা-মূলক। এখনও নোয়াখালি জেলায় মুনাপ কাজির ভিটা লোকে দেখাইয়া থাকে। কাঁইচা-নদীর কাছে সৈদপুর গ্রামে একটা স্থান "টোনা বারুইএর ভিটা" বলিয়া কথিত। ভোলা সদাগরের বাড়ীঘর ধ্বংস করিয়া যেখানে আমির সদাগর এক বিশাল দীঘি খনন করিয়াছিলেন, সেই দীঘি

এখনও বিদ্যমান। লোকেরা তাহার নাম দিয়াছে "ভেলুয়ার দীঘি।" এই পুণ্যতোয়া দীঘির জলের পবিত্রতা সন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের সকলেই স্বীকার করে। এই গল্পের আত্মত্যাগ, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও প্রেমের আদর্শ—হিমাদ্রির মত উচ্চ। এই গানটিও দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বের রচনা। বোধ হয় মোগলদের বিজয়ের পূর্ব্বে হুসেন সাহ প্রভৃতি সহৃদয় পাঠান সম্রাটদের উৎসাহে পল্লীতে পল্লীতে প্রেম ও আনন্দের যে ঢেউ বহিয়া গিয়াছিল, বঙ্গজীবনে ভাবের একটা জোয়ার আসিয়াছিল, গল্পগুলি সেই আনন্দের অভিব্যক্তি।

"সখিনা" আখ্যায়িকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এই ঘটনা জাহাঙ্গীর বাদসাহের রাজত্বের শেষদিকে ঘটিয়াছিল। ফিরোজ খাঁ দেওয়ান ইশাখাঁর পৌত্র। নেত্রকোণার অন্তর্গত কেল্লা তাজপুরের বিস্তৃত ময়দানটি পাতুয়ারা নদীর তীরে স্থিত, এখনও সেখানে প্রাচীন পরিখা ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। এই কেল্লা-তাজপুরের রণ-ক্ষেত্রে অবলা রমণী যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পল্লী-কবি তাহা সোৎসাহে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ দৃশ্যটি মহাকাব্যের উপযুক্ত। যাহার স্বর্ণবর্ণ [illegible] বক্ষে অজস্র বাণ আসিয়া পড়িয়া-ছিল—এবং যাঁহার বাহু অনবরত তিনদিন তিনরাত্র অনাহারে অনিদ্রায় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে শর নিক্ষেপ করিয়া রণোন্মাদনায় স্বীয় সৈন্যদের হৃদয়ে বৈদ্যুতিক তেজ সঞ্চার করিয়াছিল, স্বামীকে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্পে যিনি অকাতরে সর্ব্ব বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, —সেই সর্ব্বংসহা দেবীমূর্ত্তি জয়ের মুখে একটি তালাক-নামার আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না। স্বামীর প্রেম তাঁহার বাহুতে বল দিয়াছিল

ও হৃদয়ে অপরিসীম সাহসের সঞ্চার করিয়াছিল—কিন্তু যখন তাহার সেই প্রেম বিশ্বাস-হারা হইল তখন ইন্দুমতী যেরূপ একটি ফুলের আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ ভাবে একখণ্ড কাগজের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কোন্ স্থপতি, কোন্ দেশের মর্ম্মর প্রস্তরে অশ্ব হইতে পতনোন্মুখী, কেশবেশ-অসম্বৃতার এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে? এই বীরাঙ্গনার বীরত্ব ও সতীত্বের মূর্ত্তি কি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত হইলে মানাইবে, কিম্বা কষিত স্বর্ণ দিয়া তাহা গড়িলে শিল্পী পরিতৃপ্ত হইবেন? নতুবা চন্দ্রকান্ত বা চিন্তামণির উপর অমর তুলি দিয়া স্বর্ণাক্ষরে আঁকিলে সে মূর্ত্তির গৌরব অধিকতর রক্ষিত হইবে?

আয়নাবিবির পালাগানটি শেষের দিকে করুণ রস দিয়া যেন মধুচক্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সেখানে আয়নার শোকার্ত্ত মূর্ত্তি, গৃহহারার মর্ম্মভেদী দুঃখ—টেনিসনের এনক আর্ডেনের চিত্র স্মরণ করাইয়া দেয়, এই পালাটিও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

নূরন্নেহা গল্পটির অতুলনীয় নাট্যরীতি-সঙ্গত বাঁধুনি আমি নানা কারণে ভাঙ্গিয়া কতকটা নূতন গড়ন দিয়া গদ্যে পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছি; এই পালা গানটির প্রারম্ভে বহু দিনান্তে মালেক ও নূরন্নেহার মিলনের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। গল্পটি অপূর্ব্ব নাটকীয় কৌশলে পরিকল্পিত হইয়াছে। শেষ কয়েকটি পত্র না পড়া পর্য্যন্ত গল্পের মূল কথাগুলি একটা রহস্যের মত ঠেকিবে। এই কাহিনীতে বঙ্গোপসাগরের ঝড় বৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, সমুদ্রগামী জাহাজ, সুটকি মাছের কারবার ও হার্ম্মাদদের কথা ঠিক বাস্তব দৃশ্যের আলোক-

চিত্রের মত হইয়াছে, যাঁহারা বলেন, ইংরেজ আসিয়া আমাদিগকে গল্প লিখিতে শিখাইয়াছে, তাঁহারা বুঝিবেন, ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালী কৃষক যেরূপ গল্প রচনা করিতে পারিত, তাহার মধ্যে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বিলাতী ঔপন্যাসিকদের শিখিবার অনেক কথা আছে।

নছর মালুমের গল্পে রেঙ্গুনের চিত্র;—মগদিগের সমাজ ও তাহাদের মহিলাদিগের রীতি নীতি,—কৃষকদের ভাগ্য-বিপর্য্যয় এসকলই চোখে দেখা দৃশ্যপটের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে। বহু ঘটনাসঙ্কুল বিচিত্র আখ্যানের মধ্যে সর্ব্বত্র একটা দাম্পত্যের আদর্শ প্রধান নায়িকাকে মহিমান্বিত করিয়া দেখাইতেছে। জাহাজ-পরিচালক 'মালুন'গণের শিক্ষা দীক্ষা ও সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ ছবির মত ফুটিয়াছে। এই সমুদ্রতীরের দেশগুলি ঝঞ্ঝা, বন্যা ও দুর্ভিক্ষে বিপদাপন্ন হয়—আবার অন্য দিকে শ্যামল চরা-ভূমির নব শস্যসম্পদ ও কারবারের প্রাচুর্য্য পরম দর্শনীয় রূপ ধারণ করে। মানুষের ভাগ্য বিপর্য্যয় ও প্রকৃতির অনুরূপ—তাহা চাল-চিত্রের মত ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

এই গল্পগুলি পড়িলে মনে হইবে সেকালে বাঙ্গালী খাঁটি মানুষ ছিল, বিপদে পড়িলে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সচেষ্ট হইত, প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসিত, সুখ-দুঃখে সে উদ্দামশীল এবং নিজের ভাগ্য-নিয়ন্তা স্বরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে অসীম উদ্যমে কার্য্য করিত; তাহার ক্লান্তি নাই, ভয় নাই, জীবনের সম্পদ ও বিপদ সে উভয়ই চিনিয়াছিল, সে ভয়কে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ কর্ম্মক্ষেত্রে নব উৎসাহে ঢুকিত। হায়! বাঙ্গালীর এই সমস্ত গুণ এখন কোথায় গেল?

আমি ৫৮টি গল্প বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত করিয়াছি। সেগুলি যিনি যত্নপূর্ব্বক পড়িবেন, তিনি আমাদের দেশের রীতি-নীতি, সর্ব্ব বিষয়ের মূলতঃ ঐক্যের বন্ধন ভাল করিয়া বুঝিবেন, যাহারা শস্য-শ্যামলা একই বসুন্ধরার খাদ্য দ্বারা লালিত-পালিত, একই কোকিল বিশ্বস্ত বন্দীর ন্যায় প্রভাতী কুহুকুহু ডাকিয়া যাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া দেয়, যে দেশের বাঁশের বাঁশী একই ভাবে সকলের মন হরণ করে—যে দেশের নদ-নদীর সুস্বাদু জল সমভাবে পরস্পরের তৃষ্ণার নিবৃত্তি করে, যে দেশের উদার আকাশ কখনও জ্যোৎস্না প্লাবিত, কখনও রৌদ্রোজ্জ্বল ;—কখনও উল্কার নৃত্যে একই ভাবের আশঙ্কায় কুটিরবাসীদিগকে সন্ত্রস্ত করে, যে দেশের বাৎসল্য, দাম্পত্য ও সখ্য জীবনে-মরণে সমভাবে অনুপ্রেরণা দেয়,—সেই দেশবাসীর কাহারও মাথায় তুলসীপত্র, কাহারও মাথায় ফেজ—কেহ বৌদ্ধ কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ খৃষ্টান—কিন্তু তাহারা একই উপাদানে গড়া, আমি তাহাদিগকে পর ভাবিব কিরূপে? প্রাতে উঠিয়া যাহাদের মুখ দেখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি, সন্ধ্যায় ভাটিয়াল রাগিণী গাহিতে গাহিতে যাহারা পাশাপাশি জমির উপর নির্ম্মিত কুটিরে প্রবেশ করে, যাহাদের সঙ্গে চালে চালে ঠেকা-ঠেকি, একজনের ঘরে আগুন লাগিলে, জলের বালতী খুঁজিতে অপরের বাড়ীতে ছুটিতে হয়, একের ঘরের চালকুমড়া যেখানে অপরের ঘরের উপরে উঠিয়া অবাধে ফল ও ফুল প্রদান করে—যেখানে একের গাছে 'বউ কথা কও' ডাকিয়া উঠিলে অপরের ঘরে মানিনীর মান ভাঙ্গে, এক ডালের ফজলী আম অপরের উঠানে

পড়ে—এমন চিরকালের অন্তরঙ্গদিগকে আমরা পর ভাবিব কিরূপে? এই পল্লী-সাহিত্যের মধ্যে সেই পরম অন্তরঙ্গতার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক রোমান রেঁালার বিদুষী ভগিনী ম্যাদাম-ছিলা মেডিলাইন রেঁালা সম্প্রতি বঙ্গীয় এই পল্লী-গীতিকার প্রথম খণ্ডের ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। রোমানরেঁালা এই অনুবাদ পড়িয়া প্রীত হইয়াছেন এবং খ্যাতনামা ফরাসী চিত্রকর শ্রীমতী এ্যণ্ড্রি কারপেলিস অনুবাদখানি নানা চিত্রে শোভিত করিয়াছেন। অনুবাদিকা জানাইয়াছেন, তিনি ক্রমে ক্রমে এই চারি খণ্ডে প্রকাশিত গীতিকাগুলির অনুবাদ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমি তাঁহাকে জানাইয়াছি, য়ুরোপ আজকাল যেরূপ রণবাদ্যের ডঙ্কা-নিনাদে বধির, তাহাতে এই প্রেমের বেণু-বীণা রব তাহাদের কানে পৌছিবে কিনা সন্দেহ। ভারতের নীরব আত্মদান ও মহান্ প্রেমের আদর্শ ধারণা করিতে তাহাদের এখনও কিছু সময় লাগিবে।

এই মহিলাদের ছবিগুলি আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে দেশে জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সাধু জন্মিয়াছিলেন, যে দেশে পীর-আউলিয়া, বাউল ও ফকিরে ভর্তি—সে দেশের আদর্শ যে খুব উচ্চ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। যে দেশে হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর নভোমণ্ডলের উচ্চ স্তর স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, গঙ্গা শত মুখে সাগর-সঙ্গমে ছুটিয়াছে, খাল বিল নদ-নদী প্রকৃতির সর্ব্বোচ্চ তাণ্ডব খেলা খেলাইতেছে, বাঙ্গলার রাজ-ব্যাঘ্র যেখানে পশু জগতের

রাজা—সেই প্রকৃতির অদ্ভুত সৌন্দর্য্য ও ভীষণতার স্থান—সত্যই তপস্যা-ক্ষেত্র। এই সাধনার তীর্থের পথচারী কয়েকটি মুসলমান রমণীর চরিত্র অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া আদর্শ-দাম্পত্যের চিত্র দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আজকাল একদিকে সিনেমা, থিয়েটারে ও অতি-তরল গল্প-সাহিত্যে বঙ্গীয় সমাজের রুচি বিকৃত হইতেছে, ইহার মধ্যে আবার বালক-বালিকার হস্তে আমি এই গল্পগুলি কেন দিতেছি, এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই আমাকে কয়েকটি কথা বলিতে হইয়াছে।

কথিত আছে একদা আটলান্টিক মহাসাগর ক্ষিপ্ত হইয়া স্বীয় বিরাট তরঙ্গগুলির রণ-তাণ্ডব দেখাইয়া তীর-প্রদেশের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সিকতা-ভূমির কুটিরে একটি বৃদ্ধা বাস করিত, তাহার নাম মিস্ প্যারিঙ্গটন, তাহার কুঁড়ে ঘরটি মহাসাগর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে উদ্যত দেখিয়া বৃদ্ধা তাহার ঝাঁটা লইয়া তরঙ্গের গতি রোধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। এখন যাহারা যৌন-বিষয়ক গল্প-পাঠের বিরোধী, তাহাদের চেষ্টাও সেইরূপ উপহাসাস্পদ। এই প্লাবন নানা দিক্ দিয়া দেশের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, হাহাকার করিলে সে গতি থামিবে না, নৈতিক সূত্র আবৃত্তি করিয়া বক্তৃতা করিলে তাহা থামিবে না। এই রস-সাহিত্য চিরকালই আছে ও থাকিবে। মানুষের মন যাহা একান্ত ভাবে চাহে, তাহা হইতে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। তবে এখন যৌন বিষয়ে যেরূপ দুর্নীতিপূর্ণ গল্প লিখিত হইতেছে, তাহার প্রতিক্রিয়া-স্থলে পাঠকদিগকে দেখাইয়া দেওয়া উচিত যে আমাদের দেশে এই

রস-সাহিত্য শুধু শিক্ষিত সমাজে নহে, নিম্নস্তরেও বহু আকারে বিদ্যমান ছিল। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত এই গল্পগুলি তাহারই নিদর্শন। ইহাদের রস খর্জ্জুর-ইক্ষুর রসের ন্যায় স্বাস্থ্যকর এবং নির্ম্মল,—ইহাদের ভিত্তিমূলে পবিত্র দাম্পত্য ও আত্ম-ত্যাগের নীতি। এই গল্পগুলি নব-সাহিত্য পাঠের স্বাভাবিক কামনা পূর্ণ করিবে এবং তরল প্রবৃত্তিগুলির তাণ্ডব লীলা খেলা দূর করিয়া মানুষ-চরিত্র উচ্চ সাধনমার্গে প্রবর্ত্তিত করিবে। আমার পৌরাণিকীতে হিন্দু মহিলাদের দেবোপম চিত্র প্রদর্শিত করিবার চেষ্টা আছে, পুরাতনীতে প্রথম সংখ্যায় মুসলিম রমণীদেরও তদ্রূপ আখ্যায়িকা বর্ণিত হইল। আমি এই ভাবের স্বদেশীয় গল্প-প্রচারের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছি,—এই রস সুনীতির পরিপোষক ও নির্ম্মল, ইহাকে যেন 'তাড়ি' বলিয়া কেহ ভ্রম না করেন।

বেহালা
২৬শে মে, ১৯৩৩

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

মদিনা ও দুলাল

(১) মাতৃবিয়োগ ও বিমাতার ব্যবহার

বানিয়াচঙ্গের নবাব সোনাফরের মহিষী আলাল ও দুলাল নামক দুইটি শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে স্বামীকে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিয়া যান, নবাব যেন আর বিবাহ না করেন। সপত্নীর হাতে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নানারূপ লাঞ্ছনা হইবে, এই আশঙ্কায় মুমূর্ষু বেগম নিতান্ত বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

পত্নীবিয়োগের পর নবাব রাজকার্য্যে একেবারে উদাসীন হইলেন। মন্ত্রীরা দেখিলেন, নবাব সোনাফর একেবারে সংসারের প্রতি বিরাগী ও আহার-বিহারে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহারা সকলে তাহাকে বিবাহ করিতে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বলিলেন "আলাল-দুলাল আপনার কাছেই থাকিবে, আমরা তাহাদিগকে বিমাতার অন্দরে যাইতে দিব না।"

পুরাতনী

অনেক তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদের পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বানিয়াচঙ্গের নবাব দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিলেন। কিন্তু নবাব সাহেব কদাচিৎ অন্দরে প্রবেশ করেন। দিবারাত্র তাঁহার দুই পুত্র ছায়ার ন্যায় তাঁহার পাছে পাছে ঘোরে। যত আদর-সোহাগ ও যত্ন তাহারাই পিতার নিকট আদায় করিয়া লয়। নব-পরিণীতা বেগমসাহেবা ঈর্ষানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন।

একদিন মহিষী নবাবকে তাঁহার নিভৃত কক্ষে ডাকাইয়া আনিলেন।

নবাব দেখিলেন, তাঁহার রূপসী মহিষী একটি আরক্ত গোলাপের মত রাগে লাল হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার কোমল গণ্ডদ্বয়ের উপর অজস্র অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সোনাফর নবাব এইবার রূপের ফাঁদে পা দিলেন এবং সস্নেহে বেগম সাহেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —তাঁহার দুঃখের কারণ কি?

রোষ-দীপ্ত গদ্গদকণ্ঠে বেগম বলিলেন, "আলাল-দুলালকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া কেন রাখিয়াছেন? লোকে বলাবলি করে, আমি তাহাদিগকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব বলিয়া আপনার আশঙ্কা হইয়াছে, নতুবা এরূপ অস্বাভাবিক ব্যবহারের আর কি কারণ হইতে পারে! আমার কোন পুত্র-সন্তান হয় নাই, —ইহারা কি আমার পুত্র নহে, মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা আপনি কি বুঝিবেন? আমি রোজ কতরূপ মিষ্টান্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তাহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকি, হায় দুরাশা! তাহারা

একবারটিও আমার কাছে আসে না। সহচরীরা নানারূপ কথা বলে, বিষস্ফোটকে সূচীবিদ্ধ করিলে যেমন বেদনা বৃদ্ধি হয়, তাহাদের কানাকানি ও গুপ্ত মন্তব্যের আভাস আমাকে তেমনই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দেয়। আপনার ব্যবহারেই আমার এখানকার পুষ্পশয্যা কণ্টক-শয্যায় পরিণত হইয়াছে। আপনাকে শেষ ছালাম জানাইবার জন্য ডাকাইয়াছিলাম। আত্মহত্যা করিয়া মরিবার পূর্ব্বে আপনাকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম।" এই বলিয়া বেগম-সাহেবা নবাবের চরণ-তলে পড়িয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

নবাব তাঁহার মহিষীর কপট আচরণ বুঝিতে পারিলেন না; বেগমের মুখের কথায়, চক্ষের জলে ও গদ্গদ কণ্ঠস্বরে তিনি আন্তরিকতার নিদর্শন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

তদবধি আলাল-দুলাল মহিষীর অন্তঃপুরে যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। তাহাদের জন্য নানা খাদ্য বেগম প্রস্তুত করিয়া, কতরূপ পোষাক পরিচ্ছদ তাহাদিগকে পরাইয়া সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিতে লাগিলেন। বালকেরা বিমাতার ষড়যন্ত্রে ভুলিয়া গেল। আর তাহারা পিতার আঙ্গুল ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সকালে সন্ধ্যায় ভ্রমণ করে না, আর তাহারা দরবারে ঢুকিয়া নবাবের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্নেহের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে না। তাহারা অন্দরের-আঙ্গিনায় খেলা করে, বিমাতার আঁচল ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। সকলে বলিতে থাকে, বিমাতার এমন মমতা সংসারে দেখা যায় না।

(২) শ্রাবণে জলভ্রমণে বিপদ্

তখন শ্রাবণ মাস, নদীগুলি নূতন জলে ভর্ত্তি হইয়াছে। পারগুলি নব-দূর্ব্বাদল ও সবুজ কিশলয়ে নূতন শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে—দিগ্ দিগন্ত ব্যাপিয়া অসীম জলপ্রবাহ অনন্ত আকাশকে স্বীয় বক্ষে প্রতিবিম্বিত করিয়া কূলহীন দিক্‌সীমান্তে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই নূতন জলে প্রকৃতির নূতন স্ফূর্ত্তি হইয়াছে ও তরুণদের প্রাণে জল-বিহারের ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে। এমন দিনে রাণীর বাক্‌চাতুরীতে ভুলিয়া কুমারেরা নদীর জল দেখিতে ইচ্ছা করিলেন; তখন নবাব রাজধানীতে ছিলেন না। নূতন এক অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত ময়ূরপঙ্খী নৌকা প্রস্তুত হইল। রাণী বহু প্রলোভনে বশীভূত করিয়া এক জল্লাদকে সেই ডিঙ্গার কর্ণধার নিযুক্ত করিয়া কুমারদিগকে তাহাতে উঠাইয়া দিলেন; মধ্যগাঙ্গে নৌকাখানি আসিয়া পড়িল—চারিদিকে পাহাড়ের মত ঢেউগুলি জলের উপর থৈ থৈ করিতেছে, উপরে নভশ্চর পাখীরা ঝড়ের বেগে উড়িয়া যাইতেছে। জল্লাদ কুমারদিগকে বলিল, "আল্লার নাম শরণ কর, তোমাদের বিমাতা বেগমসাহেবার আদেশে আমি তোমাদিগকে এখানে জলে ডুবাইয়া হত্যা করিব।"

অনেক কাকুতি মিনতিতে জল্লাদের হৃদয় আর্দ্র হইল। সে হীরাধর নামক এক ব্যাপারীর নিকট দুই শিশুকে গোপনে বিক্রয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া রাজধানীতে বেগমসাহেবাকে তাহাদের মৃত্যু সংবাদ দিল।

(৩) অবস্থান্তর—আলালের ভাগ্যচক্র

এদিকে হীরাধর ব্যাপারীর নিষ্ঠুর ব্যবহার কুমারেরা সহ্য করিতে পারিল না। জ্যেষ্ঠ আলাল একদিন পলাইয়া গিয়া এক জঙ্গলে আশ্রয় লইল। দেওয়ান সেকেন্দর নামক ধনু নদের তীরবর্ত্তী কোন প্রদেশের নবাব আলালের অপূর্ব্ব রূপ ও তরুণ কান্তি দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন। তিনি শিকার করিতে সেই জঙ্গলে আসিয়াছিলেন, আলালকে লইয়া গিয়া নিজ রাজধানীতে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বালক অসাধারণ রূপ মনস্বী ও প্রতিভাশালী ছিল, সে লেখাপড়া শিখিয়া বিষয়-কর্ম্মে দক্ষ হইল। নবাব সেকেন্দরের ইচ্ছা ছিল, তাঁহার দুই কন্যার একটিকে আলালের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করেন, কিন্তু আলাল কিছুতেই স্বীয় পরিচয় তাঁহাকে দিলেন না এবং রাজ্যের অনেক কাজ তিনি করিয়াও কোন পুরস্কার বা অর্থের প্রার্থী হইলেন না। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি নবাব সেকেন্দরের সাহায্য লইয়া স্বীয় রাজধানী বানিয়াচঙ্গ দখল করিতে অভিযান করিলেন,—দেখিলেন, তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার বৃহৎ পুরী রাজমহিষীর অত্যাচারে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। তিনি সহসা তথায় যাইয়া পিতৃরাজ্য দখল করিয়া লইলেন। পুরাতন মন্ত্রী ও কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে পাইয়া সাদরে বরণ করিয়া লইল, বেগমকে তাহারা পরিত্যাগ করিল। তাঁহার সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইল এবং আলাল তাঁহার পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

এইবার তাঁহার বংশের পরিচয় পাইয়া সেকেন্দর তাহার সহিত স্বীয় একটি কুমারী-কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আলাল বলিলেন, তিনি নবাব হইয়াছেন, কিন্তু সিংহাসন লাভ করিয়া তাঁহার কোন সুখই হইতেছে না। তাঁহার প্রাণের ভাই দুলালের জন্য তাহার প্রাণ সর্ব্বদা আনছান্ করিতেছে, যদি দুলালকে ফিরিয়া পান, তবে দুই ভাই সেকেন্দর বাদসাহের দুই কন্যাকে বিবাহ করিবেন। নতুবা তিনি আজীবন কুমার-ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

(৪) ভ্রাতার সন্ধানে আলাল

ভ্রাতৃহারা নবাব আলাল সিংহাসনে বসিয়া সোয়াস্তি পান নাই। সেকেন্দর নবাবের কন্যা তাঁহার প্রতি অনুরক্তা, তাহার সহিত আলালের বিবাহ হইবার কথা, কিন্তু প্রাণের ভাই দুলালকে স্মরণ করিয়া দিন রাত তাহার চোখে জল ঝরে। স্নেহময় পিতা যে সিংহাসনে বসিতেন, সে সিংহাসনে বসিতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। পিতার শোকার্ত্ত মূর্ত্তি মনে হইলে হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। নদীতে ডিঙ্গি ডুবিয়া প্রাণের দুই কুমারের মৃত্যু হইয়াছে—এই সংবাদ জানিয়া তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন—গোচারণের মাঠে বৎসকে গাভীর পাছে ছুটিতে দেখিয়া তাঁহার মনে পড়িয়া যাইত—আলাল-দুলাল দুটি স্নেহশীল ছেলে ঐভাবেই তাঁহার পাছে পাছে ছুটিত; নৌকাডুবি হইলে এই দুই কুমার বিশাল ধনু নদের বক্ষে কি জানি কি ভাবে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ডুবিয়া মরিয়াছে! এই

শোকোচ্ছ্বাস ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, তিনি আহার নিদ্রা ছাড়িয়া ছিলেন—প্রৌঢ় বয়সে নবাব ক্ষিপ্তের মত হইয়া কতক দিন বাঁচিয়া ছিলেন—কিন্তু কিছুতেই সোয়াস্তি না পাইয়া একদিন শোকে-দুঃখে তাঁহার স্বর্গীয়া প্রিয়তমা বেগমের নিকট চলিয়া গেলেন—সেখানে হয়ত তাঁহার প্রাণের কুমারদ্বয়েরও দেখা মিলিবে, মরিবার সময় এই আশা করিয়াছিলেন।

আলালের সমস্ত কথাই মনে আছে,—যে ঘরে তাঁহার মাতা তাঁহার নিবিড় মেঘরাশির মত চুল ছড়াইয়া দিতেন, দাসীরা সুগন্ধি তৈল মাখিয়া বিপুল কেশসম্ভার সূক্ষ্ম বেণীজালে আবদ্ধ করিতেন, বকুল ও মালতী মালায় বেণী সাজাইতেন,—যে ঘরে মণিমণ্ডিত স্বর্ণপাত্রে মাতা তাহাকে মুক্তার ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়াইতেন, কত আদরে দুলালের চোখে কাজল পরাইতেন—যে ঘরে হাতে তালি দিয়া আলাল-দুলাল নৃত্য করিত ও মাতা তাহাদিগকে দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইতেন,—রাজপ্রাসাদের ঘরগুলি তাহাকে সেই অতীত দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। অশ্রুতে তাঁহার চোখ ভাসিয়া যাইত, নির্জ্জনে 'দুলাল' 'দুলাল' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। চতুর্দ্দিকে দেশময় লোক প্রেরিত হইয়াছিল দুলালের খোঁজে। হায় দুলাল কোথায়! চারিদিক হইতে একই খবর, প্রাণের দুলালের কোন খোঁজ নাই।

সিংহাসন কণ্টকাসনে পরিণত হইল, শয্যাগৃহে বিনিদ্র আলাল কত রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছেন, প্রতিহারী দাসদাসী পরিচারকেরা তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সতত প্রস্তুত, কিন্তু দুলালহীন

রাজ প্রাসাদ চন্দ্রহীন নিশির মত তাহার চোখে আঁধার বোধ হইত।

অবশেষে আলাল ছদ্মবেশে নিজেই ভাইকে খুঁজিতে বাহির হইলেন—লোকজন সঙ্গে নিলেন না। এই বিশাল পুরী অপেক্ষা হীরাধর বণিকের খড়ো কুঁড়ে যে শতগুণ সুখের ছিল, সেখানে আধপেটা খাইয়াও যে দুইজনে পরস্পরের গলা জড়াইয়া শুইয়া থাকিতেন, তাহা কত সুখের ছিল! স্বর্ণ-পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ-শয্যায় শুইয়াও তিনি এখন সে শান্তি পান না।

বহু পল্লী, বহু নগরী ঘুরিতে ঘুরিতে আলাল এক গৃহস্থ পল্লীতে পৌঁছিলেন। সেখানে নিবিড় সন্ধ্যায় পুষ্প-কুঞ্জের পাশে একটি রাখাল বালক গাইতেছিল,—

(৫) গান ও মিলন

"এক দেওয়ানের দেখ দুই বেটা ছিল।"

"দুই বেটা রাখি তার বিবি যায় মরিয়া।
বিবি মরিলে সাদি করিল সে মিঞা॥
সেই না দুষ্ট বিবি আরে কোন কাম করে।
বাইল (১) দিয়া জলে পাঠাইল দেওয়ানের দুই বেটারে॥
জলেতে পাঠাইয়া দিল মারিবার কারণ
আল্লার ফজলে (২) তাদের বাচিল জীবন

(১) বাইল দিয়া—ছলনা করিয়া, ভুল বুঝাইয়া, ভোল দিয়া।
(২) ফজলে—কৃপায়।

আশ্রয় পাইল তারা গৃহস্থের ঘরে।
বড় ভাই পলাইয়া গেল কোন না স'রে (৩)।
না পাইয়া ছোট ভাই তারে বিচারিয়া (৪)।
রাইত দিন যায় তার কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥

গভীর স্রোতে মজ্জমান ব্যক্তি সহসা কোন তৃণগুচ্ছের আশ্রয় পাইলে যেরূপ হয়—এই গানটি আলালের পক্ষে তেমনই হইল—এই গান নিশ্চয়ই দুলালের রচনা,—এই গান রাখাল বালকদিগকে শিখাইয়া সে দেশদেশান্তরে তাহার কথা প্রচার করিয়াছে, যদি দৈবাৎ ইহা আলালের কর্ণগোচর হয়, এই আশায়।

আলাল রাখালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, অদূরবর্ত্তী পল্লীতে গান-রচক বাস করে, সে একজন সম্পন্ন গৃহস্থ, স্ত্রী পুত্র লইয়া সেই গ্রামে বাস করিতেছে। ঠিকানা জানিয়া আলাল যাইয়া দুলালের সঙ্গে দেখা করিল।

(৬) রাজ্যলোভে কুটীর ত্যাগ

উভয়ে বাহুবদ্ধ হইয়া সাশ্রুকণ্ঠে কয়েক মুহূর্ত্ত কথা বলিতে পারিল না। শোকে গদগদ কণ্ঠ, আলাল বলিল, "ভাই আমি পিতার রাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছি। কিন্তু তাহাতে সুখ নাই—তোমাকে ছাড়া রাজপ্রাসাদ শূন্য, দেওয়ান সেকেন্দরের দুইটি অপরূপ

(৩) স'রে—সহরে।
(৪) বিচারিয়া—খুঁজিয়া।

সুন্দরী কন্যা আছে। চল, তাহাদিগকে আমরা যাইয়া বিবাহ করি এবং উভয়ে পিতৃরাজ্য একত্র ভোগ করি।"

দুলাল বলিল, "আমার আর তাহার উপায় নাই। এক গৃহস্থ এখানে আমাকে পালন করিয়াছেন। তিনি মদিনা নাম্নী তাঁহার এক গুণবতী কন্যাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও বাড়ী ঘর আমাকে লিখিয়া দিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। আমাদের সুরুজ-জামাল নামক একটি পুত্র আছে—তাহার বয়স ১২। আমি ইহাদিগকে লইয়া একরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে আছি, তুমি নবাবী কর গিয়া, আমি কৃষক জীবনে অভ্যস্ত হইয়া গেছি,—এই গৃহস্থালীতে মদিনার প্রেম আমাকে বেহস্তের (১) সুখ দিতেছে, ইহাদের ফেলিয়া আমি কি করিয়া যাইব?"

আলাল বলিল—"ছিঃ ভাই একি কথা। তুমি নবাবের বেটা, সামান্য একটি কৃষকের মেয়ে বিবাহ করিয়া কৃষক হইয়াছ, লাঙ্গল ধরিয়া চাষ আবাদ কর,—একথা প্রচারিত হইলে আমাদের এত বড় রাজকুলে কলঙ্ক হইবে, আমাদের পিতৃ-পিতামহের কুল-গৌরব টুটিয়া যাইবে। তুমি আমার সঙ্গে এস!"

দুলাল—"আমি মদিনাকে কি করিয়া ফেলিয়া যাইব—মদিনা আমা ভিন্ন কিছু জানে না, সুরুজ জামাল আমার বুকের কলিজা—সে আমাকে ছাড়া কেমনে থাকিবে? আমিই বা তাকে ছাড়া কিরূপে বাঁচিব?"

(১) বেহস্ত—স্বর্গ।

আলাল বলিলেন, "তুমি মদিনাকে তালাক-নামা দিয়া যাও। তাহার পিতৃ-সম্পত্তি যাহা আছে, তাহা তাহার ও তাহার পুত্রের পক্ষে যথেষ্ট। তালাক-নামা দিলে তোমার আর কোন দায়িত্ব থাকিবে না, সে ইচ্ছানুসারে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে।"

যদিও এই কথাগুলি তাঁহার কানে বজ্রের মত কঠোর বোধ হইতে লাগিল, তথাপি ভ্রাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও স্নেহ-নিবেদনকে সে এড়াইতে পারিল না ; সে তাহার শ্যালকের নিকট মদিনার জন্য একখানি তালাকনামা লিখিয়া দিয়া ভ্রাতার অনুগমন করিল। সেখানে নবপ্রাপ্ত রাজ্যের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাহার মন নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং মন্দিরা বেণু-ডমরু সানাই ও ঢাক-ঢোলের মধুর কলরবের মধ্যে সেকেন্দর সাহের দুই কন্যা আমিনা ও মমিনার সঙ্গে আলাল দুলালের সমারোহের সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল। অল্প কয়েকদিনের জন্য দুলাল মদিনাকে ভুলিল ও প্রাণ-প্রিয় সুরুজ-জামালকেও স্মৃতির পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলিল।

(৭) হতভাগিনী মদিনা

এদিকে মদিনার জ্ঞাতি-ভ্রাতার নিকট যে তালাক-নামা দুলাল লিখিয়া দিয়াছিল তাহা পাইয়া মদিনা হাসিয়া খুন, "তুমি আমায় পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছ।" সেই ভ্রাতা যত কথা বলিল, স্বামীর প্রতি অতি বিশ্বাসপরায়ণা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিল, আমার

স্বামী এক দণ্ড আমা ছাড়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার এই তালাক-নামা! ইহা একটা ছলনা মাত্র। আমার খসম আমাকে প্রাণ থাকিতে ছাড়িয়া দিবে না,—চালাকি করিয়া আমার মন বুঝিতেছে মাত্র, কতদিন পরে সে অবশ্য আসিবে।"

নিশ্চিন্ত মনে মদিনা স্বামীর প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। আজ আসিবে, কাল আসিবে বলিয়া মদিনা কত বিনিদ্র রাত্রি কাটাইয়া দিল। প্রত্যুষে উঠিয়া আজ নিশ্চয়ই আসিবে ভাবিয়া সে নানারূপ মিষ্টান্ন ও খাদ্যের আয়োজন করিয়া রাখে, অতি যত্নে তালের পিঠা তৈরি করিয়া স্বামীর জন্য রাখিয়া দেয়। নিত্য টাট্‌কা খৈ ভাজিয়া রাখে এবং তাহা যেন বাসী না হইয়া যায় অতি সাবধানে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। রসাল দৈ প্রস্তুত করিয়া তাহা গামছায় বাঁধিয়া রাখে, কতরূপ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া শিকায় তুলিয়া স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করে। নানারূপ ছালুন তৈরি (১) করিতে যাইয়া কত আশায় সে বসিয়া থাকে, কখনও বা টপটপ্ করিয়া চোখ হইতে অশ্রু পড়ে, বাম হাতে তাহা মুছিয়া নিশ্চিতভাবে স্বামীর আসিবার দিকে পথ চাহিয়া থাকে। যে সব পুকুরে বড় মাছ আছে, তাহাতে স্বামীর আসার প্রতীক্ষায় জাল ফেলিতে দেয় না। "অভাগী তোমার পায়ে কি দোষ করিয়াছে? তুমি কোন্ প্রাণে তাহাকে ভুলিয়া রহিলে।" ছয় মাস এই ভাবে মদিনা বিবি নিদারুণ বিরহ-উৎকণ্ঠা ও আশায় কাটাইয়া দিল, কিন্তু দুলাল ফিরিয়া আসিল না।

---

(১) ছালুন—ব্যঞ্জন।

(৮) প্রত্যাখ্যাত পুত্র

অবশেষে বার বৎসরের বালক সুরজ-জামালকে সঙ্গে করিয়া মদিনার জ্ঞাতি-ভ্রাতা একদিন দুলালের উদ্দেশে বাহির হইল,—বড় আশা করিয়া মদিনা,—দুলালের আগমন প্রত্যাশায় পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভ্রাতাকে বলিল, "খসম সময় পাইতেছে না। সুখে থাকুক দুঃখে থাকুক—সে আমারই খসম, অবশ্য সুবিধা হইলেই আমার কাছে আসিবে।"

পথ-ক্লান্ত ভ্রাতা ও কিশোর বয়স্ক সুরুজ-জামাল পদব্রজে দীর্ঘপথ পর্য্যটন করিয়া বানিয়াচঙ্গ সহরে উপস্থিত হইল। দুলালের সঙ্গে দেখা হইতে বেশী দেরী হইল না। 'বার বাঙ্গলা'র প্রকাণ্ড সজ্জিত গৃহের পাশে দুলাল দাঁড়াইয়া ছিল, সুরুজ জামাল ও তাহার মামুকে দেখিয়া সে যেন আঁতকাইয়া উঠিল।

এতদিনের পরে প্রাণপ্রিয় পুত্রের সঙ্গে দেখা। আতপ-তাপে তাহার চাঁদমুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। পিতাকে দেখিয়া আনন্দে তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল, বিরহিনী দুঃখিনী মাতাকে মনে পড়িয়া তাহার দুটি চক্ষু সজল হইল।

কিন্তু দুলালের মুখে কোন স্নেহের চিহ্ন দেখা গেল না। সে বলিল, "একি করিয়াছ! এখানে কেন আসিয়াছ? আমি এখানকার নবাব। তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে জানিলে আমার মান-সম্মান সকলই নষ্ট হইবে, তোমাদের তো কোন অভাব অভিযোগ

নাই, সেখানে তোমরা সুখেই আছ—এখানে আসিয়া আমাকে হীন ও অপদস্ত করিতেছ মাত্র। দেরি করিলে জানাজানি হইবে। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাইবে। তোমরা এখুনি এ স্থান ত্যাগ কর।"

একবার সুরুজের মুখের দিকে তাকাইল না, দুলাল বিরক্তির ভাবে মুখ ফিরাইয়া ত্বরিতপদে চলিয়া গেল।

তাহারা বাড়ীর দিকে রওনা হইল। অজস্র চোখের জলে সুরুজ পথ দেখিতে পাইল না। পথশ্রমে ও অনাহারে অভিমানী বালক দুঃখের চূড়ান্ত সীমায় পৌছিয়াছিল। সে বাড়ী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের কাছে তার দুঃখের বার্ত্তা জানাইল। মায়ের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে মদিনাবিবি "হায় আল্লা" বলিয়া জলধারাপ্লুত চক্ষে আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আমার অদৃষ্ট এমন হইবে, দুলালের প্রেম বঞ্চিত হইয়া তাহাকে হারাইয়া বাঁচিয়া থাকিব, ইহাতো জানিতাম না।"

"তুমি বনের পাখীর মত ধরা দিয়া পোষ মানিয়া পুনরায় বনে চলিয়া গেলে। আমার প্রাণ-পিঞ্জর তোমা বিহনে খালি হইয়া আছে, দেখিয়া যাও। আমি পাষাণে বুক বাঁধিয়া কেমন করিয়া একাকী এই গৃহে থাকিব! মনে পড়ে, অগ্রহায়ণ মাসের—শীতের প্রকোপে তাড়াতাড়ি হৈমন্তিক পাকা ধান সংগ্রহ করিতাম,—খসম ধান আনিতেন, আমি কুলা দিয়া ঝাড়িয়া তাহা তুলিয়া রাখিতাম—সে দিনের কথা তুমি কেমন করিয়া ভুলিলে! কি করিয়া আমাকে ছাড়া থাকিবে! তাহা তুমি পারিবে না।

মদিনা ও দুলাল

পৌষ মাসে শালি ধানে ক্ষেত্র ছাইয়া যায়, সারা রাত্রি আমি জাগিয়া পাহারা দিতাম। অতি প্রত্যূষে তামাকু-সহ হুঁকায় নূতন জল ফিরাইয়া হুঁকাটি হাতে তোমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। এখন যে দেশে আছ সেখানে কি শালি ধানের ক্ষেত নাই, তাহা দেখিয়া তোমার কি অভাগিনীকে মনে পড়ে না?

ক্ষেতগুলি জলে কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুমি ছোট ছোট চারা গাছ পুঁতিয়া দিতে, আমি সেই সকল ধানের চারা-গাছ আগাইয়া দিতাম —তুমি আমার ক্ষিপ্র কাজ করা লক্ষ্য করিয়া কত প্রশংসা করিতে। ঘরে আসিয়া তোমার জন্য ভাত রাঁধিয়া বসিয়া থাকিতাম, পাখা দিয়া তোমার গায়ের ঘাম দূর করিতাম, তুমি কত সুখে খাইতে বসিতে, তোমার খাওয়া দেখিয়া আমি কত সুখী হইতাম! কি করিয়া তুমি অভাগিনীকে ভুলিলে, শত শত সুখদুঃখের কথায় পরিপূর্ণ আমাদের জীবনের কথা কোন্ প্রাণে মন হইতে দূর করিলে?

মাঘ মাসের দারুণ শীতে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তুমি ক্ষেতে জল দিতে, আমি আগুনের হাঁড়ি লইয়া ক্ষেতে যাইতাম, তুমি আমি দুই জনে আনন্দে আগুন পোহাইতাম। বাড়ীতে আসিয়া তুমি খড় কাটিতে, আমি কলসী লইয়া জল আনিতাম। কোন সময় শালি-ধানের ক্ষেতে যে আগাছা জন্মিত—দুইজনে বসিয়া সেই আগাছা উঠাইতাম। সেই সকল দিনের কথা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ! সে যে আমার বেহস্তের কথা, আমরা দুজনে এই গৃহে বসিয়া একত্র কাজ করিতাম আমাদের পরিশ্রম বোধ হইত না, আমরা দুজনে মিলিয়া

২

মিশিয়া যে কাজ করিতাম, তাহা আল্লার নিয়োষিত কাজ, তাহা কত সুখের।"

এই সকল কথা মনে পড়িতে মদিনার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যায়। ক্রমে মদিনা আহার ছাড়িল, তাঁর চোখ দুটি কাঁদিয়া জবা-ফুলের মত রক্তবর্ণ হইল, তাহাতে আর ঘুম আসিল না। যাহা মুখে আসে তাহাই সে বকিতে লাগিল ; ক্ষণে ক্ষণে উচ্চ হাসি, পরক্ষণে কান্না, কখনও জোকার দিতে থাকে, কখনও করতালি দিয়া সারা আঙ্গিনায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ক্রমে সোনার রং মলিন হইল, মুখে যেন কেহ কাল কেশরের রস মাখিয়া দিল,—শরীর শুকাইয়া কঙ্কালসার হইল ; ঘুম নাই, খাওয়া নাই—অবশেষে সে শয্যা লইল। সুরুজ জামালের দিকে ভ্রুক্ষেপে সে দৃষ্টিপাত করে না। সে ছিল বেহস্তের পরী—একদিন সকল দুঃখের অবসান হইল। বেহস্তের পরী বেহস্তে চলিয়া গেল। এইভাবে মদিনার জীবনের অবসান হইল।

(৯) পাপের প্রায়শ্চিত্ত

সুরুজ জামালকে নিষ্ঠুরভাবে বিদায় দেওয়ার পর দুলাল-নবাবের ভাবান্তর হইল। বালক যখন দৃষ্টিপথের অগোচর হইয়াছে, তখন দুলালের মনে হঠাৎ হইল "কি করিলাম! যে সুরুজ-জামাল আমার কলিজার হাড় ছিল, তাহার শীর্ণ মুখখানি ও বিষণ্ণ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াও আমি তাহাকে একটু আদর করিলাম না। যাহাকে দেখিলে বুকে তুলিয়া লইলে আমার বুক জুড়াইত, সেই বুকের ধনকে আমি কি সব কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দিলাম!"

এই ভাবিতে ভাবিতে দুলালের ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে লাগিল ও চক্ষু সজল হইল। স্বর্ণপালঙ্কে শুইয়া যেন কণ্টক শয্যায় রাত্রি কাটিল এবং মন হইতে ঘন ঘন যে হাহাকার উঠিতে লাগিল তাহা ঘূর্ণি বায়ুর মত নিদ্রাদেবীকে চক্ষুর প্রান্ত হইতে উড়াইয়া লইয়া গেল—কেবল মনে হইতে লাগিল, সুরুজ জামাল যখন কাঁদিতে কাঁদিতে এসকল কথা মদিনাকে বলিবে, তখন যে তাহার মর্ম্ম বিদীর্ণ হইবে। হায় মদিনা! তোমার পিতা দয়া করিয়া আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত সম্পত্তি ঘর-বাড়ী যৌতুক দিয়া তোমাকে আমার হস্তে দিয়া গিয়াছিলেন। সেই সোনার মানুষ এক আশ্রয়হীন দুস্থ যুবককে স্নেহের স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধিয়া কত না যত্ন, কত না আদর দেখাইয়াছিলেন, আমি তাহার আজ ভালরকম প্রতিদানই দিয়াছি!"

"যখন মদিনার বয়স ছয় বৎসর, তখন হইতে সে একদণ্ড আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না, ছায়ার মতন আমার পাছে পাছে ফিরিয়াছে। নবাবির লোভে আমি সেই স্বর্ণপ্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়া, বজ্রাঘাতে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছি। আমি কোন্ লজ্জায় তাহাকে মুখ দেখাইব! সে আমাকে ভিন্ন জানে নাই, আমি ছাইপাশ ঐশ্বর্য্যের লোভে অমর-লোকের হীরামতি ত্যাগ করিয়াছি।" ছোট নবাব এই ভাবে উদাসীনের মত রাত দিন কাটাইতে লাগিলেন। নবপরিণীতা স্ত্রীর অন্দরে আর প্রবেশ করিলেন না।

একদিন যখন বানিয়াচঙ্গের রাজপ্রাসাদে সহস্র বাতির ঝাড়ের

আলোকে ঝলমল করিতেছিল তখন বাহিরের সূচীভেদ্য অন্ধকার ঠেলিয়া তরুণ নবাব জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া একাকী অনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিলেন। বড় নবাব আলালকে তিনি কিছু বলিয়া গেলেন না, নববিবাহিত সেকেন্দর-তনয়ার অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। দীর্ঘ পথের সঙ্গী স্বরূপ একটি সৈনিক বা দৌবারিককেও সঙ্গে লইলেন না। অশ্রুভরা চক্ষু মুছিতে মুছিতে সেই দূর ক্ষুদ্র পল্লীর পথে ছুটিলেন,—তাহার দিগ্‌বিদিক্—পথ-বিপথ জ্ঞান নাই, যে পথে পদ চলিল, দুলাল সেই পথে চলিয়া যথাসময়ে স্বীয় পল্লীতে প্রবেশ করিলেন।

অদূরে তাহার কুটীর দৃষ্টিপথে পড়িল; পথের পার্শ্বে মদিনার বড় আদরের গাভী "বেগমকে" দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। হৃষ্টপুষ্ট সেই গাভীর আদরের সীমা ছিল না; মদিনা স্বহস্তে যাহাকে ভাতের ফেন ও নব দূর্ব্বাদল খাওয়াইতেন, যাহার দেহে ধূলিবালি লাগিলে তিনি আঁচল দিয়া মুছাইয়া পরিষ্কার করিতেন, সেই গাভী আশ্রয়-শূন্য—কঙ্কালসার,—দানা-পানি খায় নাই—কিন্তু মুখ ফেনার্দ্র, জঙ্গলের দিকে হাম্বা হাম্বা রবে ছুটিয়া বেড়াইতেছে,—সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত, দুর্দ্দশার চরমে পতিত 'বেগম' গাভীকে দেখিয়া আর চেনা যায় না।

দুলালের প্রাণ অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁদিয়া উঠিল 'বেগম, উঠানে এ দুর্দ্দশা কে করিল?' পাঁচ বৎসর বয়সে—একটী সবুজ বুলবুলির ছা দুলালকে দিয়া ধরাইয়া মদিনা পোষণ করিয়াছিল; উভয়ে ক- যত্নে পালন করিয়া তাহাকে বড় করিয়াছিল। রৌদ্রের আভায়

তাহার ডানা দুইটিতে যেন কত মণিমাণিক্য ঝলসিত হইত, উঠানে তাহার এত সাধের স্বহস্তের নির্ম্মিত খাঁচাটি পড়িয়া আছে, আহার ও পানীয় অভাবে বিশীর্ণ বিবর্ণ-পক্ষ বুলবুলি ঘরের চালের উপর বসিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। গতবৎসর বৈশাখে একটি ভাল আমের চারা বহু যত্নে রোপণ করিয়া তাহারা বেড়া দিয়া রক্ষা করিয়াছিল, নবীন পত্রপল্লব শোভিত তরুণ চারাটি মৃত্তিকার আসনে ঝাঁকিয়া বসিয়াছিল। সকাল-সাঁঝে মদিনা তাহাতে জল সেচন করিত। বেড়াটী অর্দ্ধভগ্ন। কার যেন ছাগল আসিয়া তাহার ডালপাতা খাইয়া গিয়াছে, শোভাসৌন্দর্য্যহীন পত্রহীন তরুটি দণ্ডের মত দাঁড়াইয়া আছে—তাঁহার বিগত জীবনের ধ্বংসাবশিষ্ট ইতিহাসের মত।

যখন দুলাল মদিনার উদ্দেশে রওনা হইয়াছিল, তখন সেই অন্ধকার রাত্রিতে যেন তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া অশরীরী কেহ ঘন ঘন হাঁচি ফেলিতেছিলেন—সেই দুর্লক্ষণসকল ক্রমশ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

তিনি আরও দেখিলেন, মদিনার পোষা বিড়ালটা জীর্ণশীর্ণ দেহে আঙ্গিনায় ঘুরিয়া ডাকিতেছে। 'মদিনা,' 'মদিনা' বলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে দুলাল ডাকিতে লাগিলেন। কোথায় মদিনা! গৃহের আঙ্গিনা বিদ্রূপের সুরে তাহার ডাকের প্রতিধ্বনি দিয়া যেন করতালি দিয়া উঠিল। একবার হারাইলে কি আর পাওয়া যায়? হারাইয়া লোকে মূল্যবান পাথরের মর্ম্ম বুঝিতে পারে—অবশেষে দুলাল হাহাকার করিয়া পুত্রকে ডাকিল। বড় আটচালা ঘরখানির এক এক কোণ হইতে মৃতের মত এক বালক আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার

শরীর বিশীর্ণ—চোখ দুটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাঙা। দুলাল বলিলেন "সুরুজ! মদিনা কোথায় গেছে?" এক হাত দিয়া চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে অপর হাতের অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সুরুজ জামাল উঠানে তাহার মাতার কবর দেখাইয়া দিল।

এইবার দুলাল একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। "হায় মদিনা, আমার মত দুরাত্মা স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিশোধ লইয়া চলিয়া গিয়াছ! ভালই করিয়াছ। আমি তুচ্ছ রাজত্বের লোভে ঘরের হীরার খনি দেখিতে পাই নাই—আমাকে যে শিক্ষা দিয়া গেলে, তাহার উত্তপ্ত লৌহ-সূচী দিয়া আমার হৃদয়ে দাগা দিতেছে, ভালই করিয়াছ মদিনা। আমার মত পাপিষ্ঠ স্বামী এ শিক্ষা না পাইলে কিছুতেই তোমার মূল্য বুঝিতে পারিত না। কিন্তু কোন্ প্রাণে সুরুজকে ছাড়িয়া গিয়াছ?"

শিরে করাঘাত করিয়া দুলাল বসিয়া পড়িল।

"জমিনের এই সুন্দর গাছগুলি—আশমানের তারা আমার চোখে রাত্রের আঁধারের মত দেখাইতেছে, আমার বুকের কলিজা কে যেন কাটিয়া ফেলিয়াছে—আমার চক্ষে নদ-নদী শুকাইয়া গিয়াছে। সমুদ্র পাষাণের মত কঠিন হইয়াছে। তথাপি এই কুটীর এই আঙ্গিনাই আমার তীর্থ—ধিক্ আমার বানিয়াচঙ্গের রাজগী—আর রাজপ্রাসাদ!

"নবাবগিরির লোভে আসি করিলাম বেসাতি।
জমিনের ধূলার লাগি হারালাম হীরামতি॥"

চোখের জলে মুখ ভাসিয়া গেল—সেইখানে বসিয়া তিনি আলালকে

চিঠি লিখিলেন "দাদা, আমি ফকির ছিলাম পুনরায় ফকির হইলাম, আর বানিয়াচঙ্গ সহরে ফিরিয়া যাইব না।"

সেই উঠানের এক প্রান্তে একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ফকিরী বেশ লইয়া তথায় দুলাল অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিলেন। প্রেমের শক্তি বড় অসামান্য—সতীর আকর্ষণ বড় দৃঢ়, তাহা ইচ্ছা করিলেই ভাঙ্গা যায় না। ছোট নবাব দুলালের জীবনে এই সত্য পরীক্ষিত হইয়া গেল।

সখিনা

(১) কালিদাস গজদানীর ইস্‌লাম গ্রহণ

অযোধ্যার বাইসওয়ারী নামক অঞ্চলে ধনপৎ নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি প্রতাপশালী সাধুপ্রকৃতি এবং সর্ব্বজন সমাদৃত ব্যক্তি ছিলেন; দিল্লীর বাদসাহ তাঁহাকে ভালবাসিতেন এবং তিনি প্রায়ই সম্রাটদরবারে উপস্থিত থাকিতেন। তীর্থ উপলক্ষে তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং তদুপলক্ষে গৌড়ের বাদসাহ গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গতা জন্মে। ধনপৎ সিংহের পুত্র ভগীরথ সিংহ বাদসাহ জৈনুদ্দিনের অনুরোধে তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে বাস স্থাপন করেন। ভগীরথের পুত্র কালিদাস যথাকালে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কালিদাস এক-নিষ্ঠ হিন্দু এবং অতি সুদর্শন ছিলেন, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন এবং প্রত্যহ ক্ষুদ্র একটি স্বর্ণগজ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অংশগুলি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন, এই জন্য তাঁহার উপাধি হইয়াছিল 'গজদানী'। কোন একটি ষড়যন্ত্রের ফলেই হউক, অথবা মুস্‌লিম পণ্ডিতগণের তর্কযুক্তির ফলেই হউক, এই ধর্ম্মনিষ্ঠ কালিদাস গজদানী সহসা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জেলা৽ উদ্দীন বাদসাহের কন্যা মমিনা খাতুনকে বিবাহ করেন; কালিদাসের মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণের

পর নাম হয় সোলেমান খাঁ, তিনি যথাকালে অপুত্রক জেলালউদ্দীনের উত্তরাধিকারী হইয়া বাদসাহের গদীতে প্রতিষ্ঠিত হন।

কালিদাস গজদানীর (সোলেমান খাঁ) দুই পুত্র দাউদ খাঁ ও ইসা খাঁ। ইসা খাঁ মোগলদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া শেষে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মানসিংহের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন।

ময়মনসিংহে জঙ্গলবাড়ী নামক অঞ্চলে ইসা খাঁ রাজত্ব করিতেন। এই নগরী তিনি বিশাল কারুখচিত অনেক অট্টালিকা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তিনি 'বারভূঞা' অথবা বাঙ্গলার 'দ্বাদশ ব্যাঘ্রের' মধ্যে প্রতাপাদিত্যের মতই বীর্য্যশালী যোদ্ধা ও রাজনীতিতে প্রবীণ ছিলেন।

(২) নবাব ফিরোজ খাঁ

ইসা খাঁর পৌত্র তরুণ ফিরোজ খাঁ মোগল শাসনে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠেন। তিনি সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিয়া কি ভাবিতেন; মন্ত্রীদের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা বলিতেন না এবং রাজকার্য্যেও কতকটা ঔদাসীন্য দেখাইতেন। একদিন তিনি মন্ত্রীমণ্ডলী ও অন্তরঙ্গ সভাসদগণকে ডাকাইয়া নিজের মনোভাব এইরূপে ব্যক্ত করিলেন :—

"বন্ধুগণ, পূর্ব্বপুরুষ ইসাখাঁর কথা আমার সর্ব্বদা মনে পড়ে, তিনি বারবার মানসিংহকে যুদ্ধক্ষেত্রে হটাইয়াছিলেন; অবশেষে মোগলেরা তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সম্মানজনক সন্ধি সূত্রে

আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন : আমার পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই অযোধ্যায় বাইশওবারা পরগণায় অতি প্রতাপশালী ও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই মাতৃভূমির রাজস্বের অর্দ্ধেক ভাগ আমি সম্রাট দরবারে পাঠাইব এবং তাঁহাদের ন্যায়-অন্যায় সমস্ত হুকুম পালন করিব,—এই হীনতা আমার সহ্য হয় না। আমার রাজ্য ক্ষুদ্র,—আমি জগদীশ্বর তুল্য মহাসম্রাট দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া হয়ত প্রাণ হারাইব,—হয়ত আমার এই সোনার জঙ্গলবাড়ী মোগলেরা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে। কিন্তু এরূপ হীন পরাধীন জীবন অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়। অতএব বন্ধুগণ, আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহা মনোযোগ দিয়া শোন। তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও এবং সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি কর ও তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা কর, ইহা আমার শেষ সিদ্ধান্ত জানিবে। পরাধীন জীবনের দৈন্য বিষের ন্যায় আমার সর্ব্বদেহ আচ্ছন্ন করিয়াছে, আমি তাহা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছি না।"

মন্ত্রীরা স্তব্ধভাবে তাহাদের নবাবের আদেশ মাথা পাতিয়া লইল। দরবার যখন ভাঙ্গিবে, এমন সময় এক বৃদ্ধ অন্তঃপুরিকা আসিয়া ফিরোজ খাঁকে জানাইল, তাঁহার মাতা তাঁহাকে অন্দরে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। ফিরোজ অন্দরে যাইয়া মাতার সঙ্গে দেখা করিল। মাতাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সুসজ্জিত স্বর্ণ-পালঙ্কের উপর যাইয়া বসিল। তাঁহার বিক্রম-দীপ্ত তরুণ মূর্ত্তিখানি দেখিয়া ফিরোজা বেগমের হৃদয় আনন্দ ও গৌরবে পূর্ণ

হইল। দাসীরা মণিখচিত স্বর্ণপাত্রে তাঁহাকে সরবৎ আনিয়া দিল, তাহা পান করিয়া তাঁহার রাজকার্য্য-জনিত শ্রম অপনোদিত হইল। তখন ফিরোজা বেগম স্নেহার্দ্র মৃদুস্বরে পুত্রকে বলিলেন :—"তুমি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার সাধ তোমাকে একটি সুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়া আমার চিরপোষিত মনের কামনা পূর্ণ করি। তুমি আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিও না। তোমার সম্মতি পাইলেই আমি দেশ-দেশান্তরে ঘটকী পাঠাইয়া সুলক্ষণা একটি সুন্দরী কন্যার খোঁজ করি।"

ফিরোজ খাঁ বলিলেন, "মা, তুমি আমার আশা ত্যাগ কর। মোগলের অধীন হইয়া এখানে রাজত্ব করা কিছুতেই আমার সহ্য হইবে না; আমি বিদ্রোহী হইব, দরবারে রাজস্ব প্রেরণ আমি বন্ধ করিতেছি এবং যুদ্ধ সজ্জার আদেশ দিয়াছি। এই যুদ্ধে আমার মৃত্যু হইলে বিধবা পুত্রবধূ তোমার চক্ষের শূল হইবে।"

বৃদ্ধা বেগম-সাহেবা বলিলেন, "মোগলদের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ, সে তো আগুনের সঙ্গে তৃণের যুদ্ধ—এরূপ অসম সাহসিকতা দেখাইও না,—আমার এই অভিশপ্ত জীবনে তুমি আঁর কত দুঃখ দিবে? তাহা হইলে, বল, আমি বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করি।"

ফিরোজ খাঁ বলিলেন, "তুমি তো মা পূর্ব্ব ইতিহাস সকলই জান। আমার পূর্ব্ব পুরুষ ইসা খাঁ যখন এই জঙ্গলবাড়ী অঞ্চলে প্রথম আসেন, তখন দেখিতে পাইলেন একটা ইন্দুর একটা মার্জ্জারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল; এই অভূতপূর্ব্ব

দৃশ্য দেখিয়া আমার পিতামহ আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করিব, এই দেশই আমার উপযুক্ত স্থান, এখানে নেংটা ইন্দুর মার্জ্জারকে বধ করিবার শক্তি রাখে।"

এই বলিয়া ইসা খাঁ নিশাকালে অতর্কিতভাবে এই অঞ্চলের রাজভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ হাজরাকে পরাস্ত করিয়া জঙ্গলবাড়ী দখল করেন এবং এইখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন; এখানে মার্জ্জারকে ইন্দুরে মারিয়াছিল। এখানে মোগলদের বিপুল বাহিনী বারংবার ইসা খাঁর হস্তে পরাস্ত হইয়াছিল। আমি বিবাহ করিব না। আমার বিদ্রোহ অবধারিত, তুমি বাধা দিও না, সে বাধা তোমার প্রিয় পুত্র শুনিবে না, আমার কাছে আমার জন্মভূমির ডাক জননীর ডাক হইতে বড়।"

বিমনা হইয়া ফিরোজা বেগম চলিয়া গেলেন; সেই স্বর্ণ-পালঙ্কে বসিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তরুণ ফিরোজ তাঁহার সঙ্কল্প-সাধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় প্রতিহারী জানাইল, তাহার জননী ফিরোজা বেগম এক দিল্লীর তসবিরওয়ালীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

তসবীরওয়ালী তাঁহাকে সেলাম করিয়া বলিল, "আমি নানা দেশে ঘুরিয়া কতকগুলি তসবীর সংগ্রহ করিয়াছি, যদি পছন্দ হয় তবে ইহাদের কিছু রাখিতে পারেন, আপনার মাতা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

পেটিকা খুলিয়া তসবীরওয়ালী ফিরোজ খাঁকে নানা দেশের নানা পুরুষ ও নারীর চিত্র দেখাইতে লাগিল। কাশ্মীরের অতুল

কুসুমের মত কোন রমণী পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া আছে। কোনটি নির্ম্মল দীঘির জলের প্রফুল্ল নলিনীর মত সদ্য প্রস্ফুট,—কোন নারী নানারূপ বিচিত্র পোষাক-মণ্ডিত ও তাহার বক্ষস্থল হইতে সুতীক্ষ্ণ ইস্পাতের ছুরির অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে। কোন চিত্রে উষ্ণীষধারী বিপুলকায় এক মোগল একটি পার্ব্বত্য গুর্জ্জরবাসী যোদ্ধার সঙ্গে লড়াই করিতেছে, তাহার বিপুল দেহ, বিপুল শক্তি সেই ক্ষুদ্রকায় প্রতিদ্বন্দ্বীটির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না—তসবীরওয়ালী সমস্ত চিত্রের যথাযথ পরিচয় দিয়া সাটিনে ঘেরা একটি পাতলা কাষ্ঠাধার হইতে একখানি নারী-চিত্র ফিরোজ খাঁকে দেখাইল।

যেন কতদিনের সাধনার ধনকে তিনি হঠাৎ পাইলেন, তাঁহার দুটি চোখ সেই চিত্রে মুগ্ধ হইয়া রহিল। রমণীর এমন রূপ তিনি কোথায়ও দেখেন নাই। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ চিত্র কাহার?" তস্‌বীরওয়ালি বলিল, "এক সদাগর এই বাঙ্গলা দেশে সফর করিতে আসিয়াছিল, তাহার নিকট হইতে আমি এই ছবি-খানি খরিদ করিয়াছি। শুনিয়াছি ইনি কেল্লা-তাজপুরের নবাব উমর খাঁর কন্যা, ইহার নাম সখিনা; বহু নবাবের পুত্র ইহার পাণিপ্রার্থী হইয়া যাতায়াত করিতেছেন, কিন্তু সখিনাবিবির কাহাকেও পছন্দ হয় নাই।"

তসবীরখানি খুব উচ্চ মূল্যে খরিদ করিয়া ফিরোজ তাঁহার শয্যাগৃহে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। যেখানে ইসা খাঁ নানা রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে শাণিত তরবারীর বাঁট

ধরিয়া আছেন—সেই পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষের চিত্রের নিকট ফিরোজখাঁ সখিনার প্রতিকৃতি স্থাপন করিলেন; ইহা হইতে সেই ছবিটিকে কি অধিক গৌরব তিনি দিতে পারেন? শিকারে যাইবার ছলে তিনি প্রধান মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার দিয়া রাজধানী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তিন দিন জঙ্গলে হরিণ ও ব্যাঘ্র শিকার করিয়া তিনি সৈন্যগণসহ এক প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিলেন, এবং ফৌজদারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমি কতক দিনের জন্য কর্ম্মান্তরে ব্যস্ত থাকিব। তুমি এই শিবিরে আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিও।"

ফিরোজ খাঁ ফকিরের আলখাল্লা ধারণ করিলেন তাহার হস্তে সুদীর্ঘ লৌহদণ্ড ও গলায় স্ফটিকের মাল্য—হস্তে নিম ফলের জপমালা; এই বেশে তরুণ তাপসকে বড় মানাইল। তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য তপঃপ্রভাবের নিদর্শন মনে করিয়া লোকে তাহার নিকট মাথা নোয়াইল। কেল্লা-তেজপুরে এই ফকির আসিয়া কোন একটা দীঘির ঘাটে আস্তানা করিলেন; কত লোক তাঁহার নিকট আসিল, কেহ দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধ চাহিল, অপুত্রক পুত্রের জন্য নিবেদন জানাইল, অন্ধ তাহার চক্ষে দৃষ্টি ফিরিয়া আসিবার উপায় যাচ্ঞা করিয়া সেই অন্ধ চক্ষু দুটি অশ্রু প্লাবিত করিল। কপট ফকির মিষ্ট কথায় সকলেরই মন হরণ করিয়া ঔষধের স্থলে তাঁহার মাতৃহস্ত-প্রস্তুত নানারূপ মিষ্টান্ন বিতরণ করিতে লাগিল।

কেল্লা তেজপুরের নবাব তখন নিদারুণ ব্যাধিগ্রস্ত। বহু-লোকের নিকট তিনি শুনিলেন, তাঁহারই রাজধানীতে একজন গুণী

তরুণ ফকির শুভাগমন করিয়াছেন, তাঁহার ক্ষমতা অলৌকিক। তিনি দুঃসাধ্য পীড়া মন্ত্রবলে আরোগ্য করিতে পারেন।

নবাব সাহেব তাঁহাকে আনিবার হুকুম দিলেন। ফকির নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তপুরিকারাও এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ফকিরের নিকট আসিয়া অবগুণ্ঠন মোচনপূর্ব্বক প্রণতি জানাইল।

নবাব তরুণ ফকিরের মিষ্ট ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইলেন। তাঁহার উপদেশ ও প্রবীণোচিত ব্যবহারে যেন নবাবের রোগের জ্বালা অনেকটা জুড়াইয়া গেল।

(৩) প্রথম মিলন

অন্তঃপুরের একটা কাক-চক্ষুর ন্যায় কৃষ্ণ ও নির্ম্মল সলিলা দীঘির মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাটে সখিনা বসিয়াছিলেন। তাহার দীর্ঘ বেণী বিসর্পিত হইয়া হাতের উপর ন্যস্ত ছিল। সহচরী-দের সাহায্যে তিনি খোঁপা খুলিতেছিলেন; তাঁহার মনোরম চোখের দৃষ্টিতে যেন প্রেমের দেবতা স্বীয় ধনুর্গুণের সমস্ত ফুলশর যোজনা করিতেছিলেন, গ্রীবাভঙ্গী কি মধুর। স্রষ্টা যেন এই মূর্ত্তিতে তাঁহার রূপ-সৃষ্টির সেরা আদর্শ স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

সখিনা ফকিরের কথা শুনিয়াছিলেন; তিনি অসম্বৃত কেশে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ফকিরের সঙ্গে কিছুকাল আলাপ করিলেন। নবাব-কন্যা অনেক রাজকুমার ও সম্ভ্রান্ত বংশের যুবক দেখিয়াছেন, কিন্তু এই ফকীরি বেশের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় যে তেজ ও

রূপরশ্মি দেখিতে পাইলেন, তাহা তাহার মনে সহসা বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। ফিরোজ খাঁ দেখিলেন, চিত্রপটে সখিনার যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, জীবন্ত সখিনা তদপেক্ষা অনেক বেশী সুন্দর,—তাহার মধুর বাক্য তাঁহার কর্ণে বীণা ধ্বনির মত মিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। যে জগদীশ্বর তাঁহার অতুলনীয় রূপ-সৃষ্টির এই নিদর্শন তাঁহাকে দেখিবার জন্য চক্ষু দুটি দিয়াছেন, তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত সেই জগদীশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম জানাইলেন।

ফকিরের সঙ্গে সখিনার যে আলাপ হইল,—তাহাতে ভাবী মিলনের পূর্ব্ব-সূচনা হইয়া গেল, কিন্তু এই ফকিরের সঙ্গে দাম্পত্য-সম্বন্ধ স্থাপনের আশা সখিনার মনে তখনও সুদূর-পরাহত,—তখনও সেরূপ সুখ-স্বপ্ন তাঁহার মনে গড়িয়া উঠিতে সাহসী হয় নাই।

ফিরোজ খাঁ স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, পরিচয় জানিলে তাহার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে সখিনাবিবির হয়ত অমত হইবেনা।

কতকটা হৃষ্টচিত্তে ফিরোজ খাঁ রাজধানীতে আসিয়া তাঁহার মাতাকে বলিলেন "মা, তোমার মনে কষ্ট দিয়া আমি অনুতপ্ত হইয়াছি; আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমি একটি মেয়ে দেখিয়া আসিয়াছি, যদি তুমি তাহার সহিত সম্বন্ধের প্রস্তাব কর, তবে আমি রাজি আছি।" কতকটা লজ্জা ও কতকটা দ্বিধার সঙ্গে এই কথা বলিয়া দ্রুত পদক্ষেপে ফিরোজ বহির্বাটিতে চলিয়া আসিলেন এবং বৃদ্ধ উজীরকে দিয়া মাতাকে সংবাদ দিলেন।

মাতা ফিরোজা বেগম পুত্রের এই ভাবান্তর দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইয়া পরম আনন্দে উজীরের কাছে সমস্ত খবর শুনিলেন। কিন্তু উজীরের মুখে যখন তিনি জানিতে পারিলেন, কেল্লা তাজপুরের নবাব উমর খাঁর কন্যা সখিনা বিবির পাণিগ্রহণে তাহার পুত্রের আগ্রহ, তখন অকস্মাৎ তাহার প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া পড়িল। তিনি উজীরের মারফৎ হাঁ, না, কিছু সংবাদ বলিয়া না পাঠাইয়া ফিরোজকে তাঁহার কক্ষে ডাকাইয়া আনিলেন।

ফিরোজা বেগম বলিলেন, "সখিনা বিবি যত সুন্দরীই হউন না কেন, তদপেক্ষা সুন্দরী ও গুণশীলা কন্যা আমি ঘরে আনিব। তুমি সম্মতি দাও, আমি নানা দেশে নবাবদের ঘরের প্রত্যেক অবিবাহিতা মেয়ের চিত্র আনাইয়া তাহাদের গুণপণা ও বংশমর্য্যাদার বিচার করিয়া তোমার বিবাহ স্থির করিব। কিন্তু উমর খাঁয়ের কন্যাকে আমাদের ঘরে আনার বিঘ্ন আছে।"

উৎকণ্ঠিতভাবে ফিরোজ জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি বিঘ্ন ?'

মাতা।—"উমর খাঁ চিরদিন আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া আসিয়াছেন। জঙ্গলবাড়ীর এই চিরশত্রুর কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করিতে স্বতই আমার মনে দ্বিধার ভাব উপস্থিত হয়; এই বিবাহে উভয় পক্ষেরই মর্য্যাদার হানি হইবে। এমন কি, তাঁহারা হয়ত অমত করিতেও পারেন।"

ফিরোজ—"মা, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যত বিঘ্ন বা বাধা থাকুক, তাহা অতিক্রম করিয়া আমি এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিব। ইহাতে তুমি রাজি না হও, কিম্বা এ সম্বন্ধ আমাদের

বংশের পক্ষে অমর্য্যাদাকর মনে কর, তবে বেশ, তাহাই হউক,—আমি যে চিরকুমার ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তাহাই গ্রহণ করিয়া চিরকাল অবিবাহিত জীবনযাপন করিব।"

ক্ষুণ্নমনে ফিরোজ খাঁ নিজ কক্ষে যাইয়া এক বৃদ্ধা দাসীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নানা কথাবার্ত্তার পর তিনি তাহার একটি তসবির দিয়া দাসীকে কেল্লা-তাজপুরে সখিনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ফকিরের দূতী-হিসাবে কেল্লা-তাজপুরের অন্দর মহলে দাসী প্রবেশ করিয়া সখিনাকে সেই তসবিরখানি উপহার দিল। এ আর ফকিরের বেশ নহে—সুসজ্জিত সুন্দর নবাব পুত্র, তাঁহার দেহে শৌর্য্য-বীর্য্য যেন একাধারে খেলিতেছে। নেত্রদ্বয় প্রতিভায় দীপ্ত, এবং মুখে শত শত বন্য কুসুমের লাবণ্য, কবাট-বক্ষ, দৃঢ়বাহু, অথচ ক্ষিপ্রগতি একখানি ডিঙ্গির মত সুঠাম গঠনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লীলাচঞ্চল গতিশীলতা বুঝাইতেছে। এই মূর্ত্তি তিনি পূর্ব্বেও কোথায় দেখিয়াছেন এবং তাহার মন ইহারই রূপে বাঁধা পড়িয়াছে, এই একটা অস্পষ্ট স্মৃতি জাগিল। দাসী বলিল, "দেখেছেন কি! ইনি জঙ্গলবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ নবাব ইসা খাঁর পৌত্র,—নবাব ফিরোজ খাঁ, ইনি কয়েক মাস পূর্ব্বে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া—একবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তিনি নবাবের তক্ত ত্যাগ করিয়া ফকির হইয়া বনে জঙ্গলে ও পল্লীতে পল্লীতে সেই কুমারীর জন্য পাগল হইয়া ঘুরিতেছেন।"

বলা বাহুল্য—দাসী এ সকল কথা ফিরোজ খাঁর শিক্ষা মতই বলিয়াছিল।

ফিরোজ খাঁ ফকির হইয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিতেছেন, শুনা মাত্র তসবীরটি সখিনা চিনিতে পারিলেন। তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট ফকিরই সে এই তরুণ নবাব তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

তখন অতি করুণ কণ্ঠে ও সকাতর আগ্রহে তিনি দাসীকে অনুনয় করিয়া বলিলেন, "বল কে সে সৌভাগ্যবতী কুমারী যাহাঁকে দেখিয়া কুমার ফকির সাজিয়াছেন, অর্দ্ধশাসন অনশনে দিনযাপন করিয়া বনেজঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন?"

দাসী বলিল—"সে কন্যা এদেশে সর্ব্বজন পরিচারিতা গুণশালিনী অপূর্ব্ব রূপবতী সখিনা বিবি, নবাব উমর খাঁর কন্যা।"

এই কথা শুনিয়া সখিনার চক্ষু হইতে টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে বলিল "এই হতভাগিনীর জন্য নবাবপুত্র ফকির সাজিয়াছেন, তিক্ত কষায় বন ফল খাইয়া বনে বনে ঘুরিতেছেন! ধিক্ আমার রূপকে;—তুমি তাঁকে ব'লো, তিনি যেদিন আসিবেন, সেই দিনই দাসী হইয়া তাঁহার পদে আপনাকে নিবেদন করিয়া দিব, আমার জন্য তিনি এত কষ্ট সহিতেছেন! ধিক্ আমাকে ও আমার রূপকে!" এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কুমারী স্বীয় শাড়ীর অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া বিমনা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দাসী তসবীরের বিনিময়ে রাজকুমারীর কণ্ঠাবলম্বিত বহুমূল্য মুক্তার হার পুরস্কার পাইয়া জঙ্গলবাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিল।

(৪) ফিরোজা বেগমের দূত

ফিরোজা বেগম মনে ভাবিলেন, "যাক্ আমার বংশের মর্য্যাদা, সিংহাসনের সম্ভ্রম ও মান-অপমান! আমার ফিরোজ যাহাতে সুখী হয়, আমি তাহাই করিব। তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কিছুতেই আমি তাহার মুখ মলিন দেখিতে পারিব না। আমি তাহার সুখের জন্য প্রাণ দিতে পারি।"

এই চিন্তা করিয়া ফিরোজা বেগম তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে ডাকিয়া আনিয়া কেল্লা তেজপুরের নবাব উমর খাঁর নিকট উপঢৌকনাদিসহ ফিরোজ খাঁর সঙ্গে সখিনার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

উমর খাঁ সুস্থ হইয়া দরবারে বসিয়াছিলেন। তখনও শরীর তেমন ভাল হয় নাই, কয়েকজন হেকিম ও ভিষক তাহার সিংহাসনের পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন; প্রধান মন্ত্রী কাজকর্ম্মের তালিকা বুঝাইয়া দিয়া নবাবের পাঞ্জা ও শিলমোহর করিয়া দলিল ও আদেশপত্রে নবাবের দস্তখৎ লইতেছেন:—এমন সময় দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু দোলাইয়া বহুমূল্য জামাজোড়া পরিহিত জঙ্গলবাড়ীর উজীর সাহেব সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন।

উজীর সাহেবের সঙ্গে নানা ভদ্রতাসূচক কথাবার্ত্তা হইল। উজীর উপঢৌকনাদি দিয়া ধীরে ধীরে বিবাহের প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলেন, প্রবল প্রতাপ ইসাখাঁর শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী—যাহা কাহারও অবিদিত নহে,—তাহা স্বল্পাক্ষরা কয়েকটি কথায় উল্লেখ

করিয়া তরুণ সূর্য্যের ন্যায় ফিরোজ খাঁর অলৌকিক প্রতিভার বর্ণনা দিলেন এবং উপসংহারে বলিলেন,—যদিও কোন এক সময় কেল্লা-তাজপুরের সঙ্গে তাঁহাদের কতকগুলি অসন্তোষকর বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল, আশা করি, তাহার জের এখন আর নাই। তরুণ নবাবের মাতার ইচ্ছা, এই বিবাহ-সূত্রে দুই রাজ-পরিবারের মধ্যে এখন মৈত্রী সংস্থাপিত হয়—এবং প্রাচীন বৈরীভাবের উপর চিরকালের জন্য যবনিকা পতিত হইয়া যায়।

উমর খাঁ কতকক্ষণ চুপ করিয়া এই প্রস্তাব শুনিলেন। তাঁহার উদ্ধত ক্রোধ যেন সমস্ত মুখমণ্ডলকে দীপ্ত করিয়া শ্মশ্রুরাজির উপর পর্য্যন্ত রক্তিম আভা বিস্তৃত করিয়া দিল। ক্ষণকাল তাঁহার কোন বাক্যোদ্গম হইল না—তাহার পর বাঁধ ভাঙ্গিলে যেরূপ গৈরিক স্রোত বেগসহকারে বহির্গত হয়, তেমনি অজস্র বাক্যে তাঁহার ক্রোধের অভিব্যক্তি হইল।

উমর খাঁ বলিলেন, "এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার গিরিশৃঙ্গের মত উচ্চ কুল পাতালে অবনত করিয়া আমি সেই কাফের বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা করিব! উজীর, তুমি শৃগালের গর্ত্তে বাস কর, তুমি সিংহের বিবরে অপমানিত হইতে আসিয়াছ? যে বংশ সেদিন পর্য্যন্ত কাফের ছিল, এখনও যে পরিবারের মেয়েরা সুরমা না পরিয়া চোখে কাজল পরে,—মেন্দির রসে চরণ রঞ্জিত করিতে জানে না, আলতার পাতা লইয়া টানাটানি করে, যে পরিবারে এখনও পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়িতে ভুলিয়া যায় এবং যাহারা স্ফটিকের পরিবর্ত্তে এখন রুদ্রাক্ষ লইয়া টানাটানি করে,

—এখনও কচ্ছহীন না হইয়া যাহারা ভুলে ত্রিকচ্ছ পরিয়াই নমাজের পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করে, যাহারা গরুকে মাতা বলিয়া মনে করে ও পীরের মন্দিরে সিন্নি দেয়—গোহত্যা দর্শন করিলে যাহারা শিহরিয়া উঠে, এবং আল্লা বলিতে যাইয়া ভ্রমক্রমে 'জয় মা তারা' বলিয়া উঠে—সেই ঘৃণিত কাফের বংশে আমার কন্যাকে দিব! আমার উচিত, উজীর, তোমাকে জিহ্বা কাটিয়া দিয়া বিদায় করিয়া দেই। কিন্তু তাহা করিব না। কাফের প্রদত্ত এই উপঢৌকন আবর্জ্জনার স্তূপে ফেলিয়া দাও, এই উজীরকে দাড়ি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘাড় ধরিয়া পুরীর বাহির করিয়া দাও।" পরিচারকেরা নবাবের আদেশ পালন করিল।

সখিনা বিবি স্বীয় প্রকোষ্ঠে এই বিবরণ শুনিয়া মৌন প্রতিমার মত বসিয়া রহিলেন, তাহার দুটি চোখে চঞ্চল মুক্তাদামের মত দুটি অশ্রু টলটল করিতে লাগিল।

(৫) কেল্লা তাজপুরে অভিযান

অপমান ও পীড়নে ক্রুদ্ধ কেউটের মত রক্তচক্ষে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে বৃদ্ধ উজীর জঙ্গলবাড়ীতে যাইয়া ফিরোজসাহের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

তখনই বিপুল এক বাহিনী যুদ্ধ সজ্জা করিয়া কেল্লা-তাজপুর অভিমুখে রওনা হইল। সশস্ত্র সেনাপতি ও ফৌজদারগণ শত শত যুদ্ধ-হস্তী, শত শত সুসজ্জিত রণ-ঘোটক ও উট লইয়া উত্তর-

দিকে অভিযান করিল। ফিরোজ খাঁর সৈন্য-সংখ্যা ৬০ হাজার। তাঁহারা এক প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের মত অতর্কিতভাবে কেল্লা তাজপুরের উপর নিপতিত হইল, তাহাদের বিক্রমে ও পদভরে ধরণী টলমল করিতে লাগিল।

জঙ্গলবাড়ীর সৈন্যেরা কেল্লা তাজপুর বিধ্বস্ত করিল,—পুরীতে আগুন লাগাইল, রাজবাড়ী একটা অগ্নিস্তূপের মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। উমর খাঁ বন্দী হইয়াছিলেন কিন্তু কোনক্রমে নিষ্কৃতি পাইয়া পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। ফিরোজ খাঁ স্বয়ং কেল্লা তাজপুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সখিনা বিবিকে লইয়া আসিলেন।

পিতৃপুরী ধ্বংস হওয়াতে সখিনার চোখ অশ্রুপূর্ণ। এই সজল-নয়না তাহার প্রাণ-প্রিয়তম ফিরোজকে কোন বাধা দিল না। ময়ূরপুচ্ছ আবৃত শীতল সৌধরাজির মধ্যে বকপক্ষাচ্ছাদিত এক নবোদিত জ্যোৎস্না-শুভ্র মণ্ডপে সখিনা ও ফিরোজের বিবাহ হইয়া গেল। মরাল-মরালী যেরূপ নদী-স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়—মিলনানন্দে নবদম্পতি সেইরূপ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

(৬) লাঞ্ছিত নবাবের প্রতিশোধ

এদিকে উমর খাঁ নবাব লাঞ্ছিত, হৃতসর্ব্বস্ব ও অপমানিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে দিল্লীর দরবারে রওনা হইলেন। একটি কৃষ্ণবর্ণ চামরের ন্যায় পুচ্ছবিশিষ্ট উৰ্দ্ধকর্ণ অশ্বরাজের উপর আরোহণ করিয়া অবিন্যস্ত কেশ-শ্মশ্রু ও শুষ্কমুখে ধূলিধূসর দেহে ছুটিয়া চলিলেন

সম্রাটের দরবারে। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা করিয়া তিনি শোকোচ্ছ্বাসে তাহার পদতলে পড়িয়া নিজের অবস্থা জানাইলেন—রোজা নমাজ বিরহিত, পাষণ্ড জঙ্গলবাড়ীর নবাবের সমস্ত কাহিনীর একটা বিবৃতি দিলেন ;—সে কি করিয়া বিনাদোষে সহসা তাহার পুরী আক্রমণ করিয়া অগ্নিসংযোগে তাহা ধ্বংস করিয়াছে, তাহার এক কিঙ্কর গ্রীবা ধরিয়া তাহাকে কি ভাবে বন্দী করিয়া অপমান করিয়াছে—তৎপর সে নিজে অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার দুলালী কন্যা সখিনাকে জোর করিয়া জঙ্গলবাড়ী লইয়া গিয়াছে ও তাহার অমতে বিবাহ করিয়াছে।

যদি সম্রাট এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে তাহাকে সাহায্য না করেন, তবে দরবারে সে না খাইয়া ধন্না দিয়া থাকিবে এবং অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে।

জাহাঙ্গীর জঙ্গলবাড়ীর তরুণ নবাবের কথা ভালরূপই জানিতেন —সে কয়েক বৎসর যাবৎ রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়াছে এবং মোগলসম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগ করিতেছে। ঘৃতভাণ্ডে যেন কেহ আগুন প্রক্ষেপ করিল, তাহার ক্রোধ প্রলয়ঙ্করভাবে দেখা দিল। তিনি তাঁহার ফৌজদারগণকে আদেশ করিলেন—"অবিলম্বে বহু সৈন্য লইয়া ভাটি অঞ্চলে যাও।" জঙ্গলবাড়ীতে যাইয়া সেই রাজধানী ধ্বংস করিয়া ফিরোজখাঁকে বাঁধিয়া লইয়া আইস।"

উমর খাঁ সেনাপতি হইয়া এক লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সহ জঙ্গলবাড়ীর দিকে রওনা হইল। চিত্রকাননা বাঙ্গালার বুকের

উপর দিয়া আর এক বার মোগলেরা—বহু নদনদী কান্তার অতিক্রম করিয়া বিদ্রোহীকে শাস্তি দিতে অভিযান করিল। এবার এই বাহিনীর সেনাপতি এক বাঙ্গালী মুসলমান।

ফিরোজ খাঁর সৈন্ত জঙ্গলবাড়ী হইতে দুই দিনের পথ পূর্ব্বোত্তরে যাইয়া—মোগল সৈন্তের গতিরোধ করিল। ফিরোজা বেগম পুত্রকে স্বয়ং যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিলেন, "তোমার ফৌজদারদিগকে পাঠাও, তাহারাই যুদ্ধ করিবে—প্রয়োজন হইলে তুমি পরে যাইবে।" নবাব বলিলেন, "তাহা হয় না, মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে তাহাদিগকে ক্রমাগত রণোন্মাদনা দিতে হইবে, আমি ছাড়া তাহা আর কেহ পারিবে না," জননীকে প্রণাম জানাইয়া ফিরোজ খাঁ সখিনার কক্ষে আসিলেন।

দেখিলেন, পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় রূপসী নবাব-কন্যা তুষ্ণীম্ভাবে বসিয়া আছেন, তাঁহার স্বামী যাইতেছেন পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে। সখিনা পীরের প্রসাদ স্বামীকে দিলেন এবং বলিলেন, "রণজয়ী হইয়া তুমি ফিরিয়া এস, আমি আল্লার নিকট এই প্রার্থনা করিয়া এখানে তোমার প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।"

ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরদিন ফিরোজের গৃহে ফিরিবার কথা!

সখিনা তাহার প্রিয় সহচরী দরিয়াকে বলিল, "তোমরা এখনও কোন উদ্যোগ করিতেছ না কেন? ফোয়ারার জল এখনও গোলাপবাসিত করিয়া রাখ নাই। রণজয়ী পরিশ্রান্ত স্বামীকে স্বর্ণপাত্রে পানীয় দিতে হইবে তাহা কি স্মরণ নাই?"

সখিনা

"তুমি এখনও পঞ্চপীরের দরগায় গেলে না! রণজয়ী স্বামী যে দরগার প্রসাদ একটু খাইয়া তার পর অপরাপর মিষ্টান্ন খাইবেন। একি গোলাপ ও চামেলি যে সারাদিন রৌদ্রের তাপ সহিয়া হেলিয়া পড়িয়াছে, এখনও ফুলগুলি তুলিয়া মালা গাঁথিলে না! রণজয়ী স্বামীকে যে আমি ফুলহার পরাইয়া পুষ্পশয্যায় বসাইয়া বাতাস করিব, তোমরা আজ এমন উদাসিনীর মত কর্ত্তব্য হেলা করিতেছ কেন? আজ অজুর পানি পর্য্যন্ত তুলিয়া রাখ নাই,—আবের পাখাখানিকে ফুলসাজে সাজাও নাই, আতর ও গোলাপজলের শিশিগুলি শূন্য। আজ রণজয় করিয়া স্বামী ফিরিতেছেন, সুগন্ধী তৈল ও আতর দ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সেবা করিব। মণিখচিত পানের বাটাগুলি শূন্য—আজ এত উদাসীন তুমি কেন হইলে? এ কি দরিয়া! আঁচলে চোখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে কেন! এই শুভযোগে স্বামীর যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিবার মুখে কে তোমার মনে ব্যথা দিয়াছে। যা'ক সে সকল কথা পরে শুনিব, কিন্তু এই রণজয়ের উৎসবটা কাঁদিয়া কাটিয়া তোরা মাটি করিস না—গরম জলে সাবান গলাইয়া অশ্বশাল-রক্ষককে প্রস্তুত থাকতে বল গে, রণশ্রান্ত হইয়া 'দুলাল' ঘোড়া আসিতেছে। ঐ যে তার হ্রেষা রব শোনা যাইতেছে, কিন্তু এই হ্রেষাস্বর তো দুলালীর বিজয়ের সুর নহে, এ যে তাহার মর্ম্মান্তিক কান্নার সুর—দেখ কি হইল—এই বলিয়া সখীনা মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

(৭) যবনিকা পতন

স্বেদজল সিক্ত রক্তাক্ত কলেবরে দুলাল ঘোড়া কালো নিশান লইয়া আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া জঙ্গল বাড়ীর নবাবের পরাজয় জানাইল, সঙ্গে সঙ্গে দূত আসিয়া দুঃসংবাদ জানাইল। দুইদিন ঘোরতর যুদ্ধের পর তরুণ নবাব উমর খাঁর বন্দী হইয়া তাজপুরের কেল্লাতে বদ্ধ হইয়া আছেন। রাজ্যময় শোকার্ত কলরব উঠিল। ফিরোজা বেগম কাঁদিতে কাঁদিতে মুহুর্মুহু জ্ঞান হীনা হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

কিন্তু বিষণ্ণ প্রস্তর প্রতিমার ন্যায় সখিনা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার চোখে এক ফোঁটা জল নাই, একটি দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইল না। সহচরীরা নবাবের আসন্ন বিপদ আশঙ্কা করিয়া কত বিলাপ করিতে লাগিল, সখিনা তাহাদের সুরে সুর মিশাইয়া সে বিলাপে যোগ দিলেন না বা তাহাদের আশঙ্কায় বিচলিত হইলেন না। তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া তাঁহার শাশুড়ীর নিকটে আসিলেন এবং সেই শোকার্ত্তা রমণীকে ধরিয়া তুলিয়া পালঙ্কে বসাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এইবার তাঁহার নয়ন কোণে মুক্তার মত একটি অশ্রু দেখা গেল। তিনি ধীরে ধীরে ফিরোজা বেগমকে বলিলেন, "মা, আপনি অনুমতি দিন্, বিজয়ী সৈন্য কেল্লা তা'জপুরে চলিয়া গিয়াছে, আমি সেইখানে যাইয়া যুদ্ধ করিব, আমি প্রধান প্রধান ফৌজদারের নিকট ছোটকালে যুদ্ধ-বিদ্যা শিখিয়াছি, মোগল সৈন্য আমার স্বামীকে বন্দী করিয়াছে, তাহাদের কত বল দেখিয়া লইব। আমার পিতাকেও আমি আমার শক্তি

বুঝাইয়া দিব।" ফিরোজা বেগম বলিলেন "শোকে তুমি পাগল হইয়াছ, তোমার স্বামীর মত যোদ্ধা যে ক্ষেত্রে হারিয়া গিয়াছে, তুমি অবলা নারী হইয়া সেখানে কি করিবে? আমার পুত্র গিয়াছে —তাহার কি গতি হইবে জানি না" বলিতে বলিতে স্বামীপুত্রহীনা বেগম ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি আমার ভাঙ্গা বুকটা জুড়াইয়া এইখানে থাক—তাহাতে আমার এই দুঃখার্ত্ত হৃদয় কথঞ্চিৎ জুড়াইবে।" সখিনা বেশী কথার কাটাকাটি করিলেন না, বেগমসাহেবার পায় ধরিয়া বলিলেন, "মা আমার সঙ্কল্প অটুট, আমি আমার স্বামীর গলায় জয়-মাল্য পরাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিব, যদি তাহা না পারি," এবার কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, "তবে উভয়ে যুদ্ধ করিয়া এক কবরে স্থান করিয়া লইব। ইহার অধিক নারী জন্মের আর কি সার্থকতা আছে?" সখিনা রণবেশ পরিয়া বাহির হইল, কিন্তু আজ তাঁহার রণরঙ্গিণী বেশ নহে, তিনি পুরুষ যোদ্ধার সাজ পরিয়া বন্দুক হাতে লইয়া লাফাইয়া দুলাল ঘোড়ার পিঠে চাপিয়া বসিলেন। দরিয়াকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার কথা তুই গোপন রাখিস, জঙ্গলবাড়ীর অবশিষ্ট ত্রিশ হাজার সৈন্যকে তুই আমার সঙ্গে কেল্লা তাজপুরে যাইতে প্রস্তুত হইতে বল গে। আর শোন, বলিস যে নবাবের এক তরুণ মামাত ভ্রাতা বিদেশ হইতে আসিয়াছেন, তিনিই তোমাদের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করিবেন।"

শাশুড়ীর পায় ধরিয়া তিনি অনুমতি লইলেন—তাহার যোদ্ধার বেশ দেখিয়া মাতা চমৎকৃত হইয়া গেলেন—এ যেন স্বয়ং যুদ্ধের

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তেমনি তেজস্বী, তেমনি স্বীয় সা... বিশ্বাস পরায়ণ ও বেগবতী নদীর ন্যায় সমস্ত বাধা বিঘ্নের প্রতি উপে...।

এই নবীন সেনাপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ বানের মত জঙ্গলবাড়ীর অবশিষ্ট সৈন্য ছুটিল। সেনাপতি যুদ্ধ জয় করিতে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে চলিয়াছেন, তাঁহার অসামান্য তেজস্বীতা ও দুর্জ্জয় সাহস যে প্রেরণা সঞ্চার করিল—তাহা বিদ্যুতের মত সৈন্যদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইল, মোগলেরা বিজয় দর্পে স্ফীত, তাহারা প্রথমত এই নবাগত দিগকে গ্রাহ্য করিল না।

কিন্তু পরে দেখা গেল মৃত্যু পণ করিয়া তাহারা যুদ্ধ করিতেছে —এই নূতন ফৌজে এক একজন, একটি লৌহ মুষলের মতো,—তাহারা যেন অজেয়, অমর। দুই দিন ভীষণ যুদ্ধের পর মোগল সৈন্য হটিতে আরম্ভ করিল, এই দুই দিন সখিনা সর্ব্বপেক্ষা অগ্রগামিনী, ক্ষুধা তৃষ্ণা, দেহের সুখ দুঃখ বোধ এ সমস্ত যেন তাঁহার কিছুই নাই। কত বাণ তাহার উপর পড়িতেছে তাহার কতকগুলি বর্ম্মে পড়িয়া ব্যর্থ হইয়াছে, কতকগুলি তাহার দেহে বিদ্ধ হইয়াছে। শন্ শন্ শব্দে বন্দুকের গুলি তাহার চারিদিকে আকাশে ছুটিয়াছে—কারণ সকলের লক্ষ্য এই দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতিটির প্রতি।

দুই দিন পরে কেল্লা তাজপুরের লৌহ দ্বার ভেদ করিয়া তাঁহারা —ভিতরে প্রবেশ করিল ও কেল্লায় আগুন লাগাইয়া দিল। যখন জঙ্গল বাড়ীর জয় সুনিশ্চিত, তখন কে একটি যোদ্ধা শুভ্র পতাকা হস্তে লইয়া জঙ্গল বাড়ীর সেনাপতির নিকট দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "কে আপনি জঙ্গল বাড়ীর প্রতি এতটা দরদী, এই

অসামান্য যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন ? কিন্তু এই জয় শেষ নহে ; মোগল সম্রাটের সঙ্গে জঙ্গলবাড়ী কিছুতেই শেষ পর্য্যন্ত আটিয়া উঠিতে পারিবে না ; ভীষণ সমরানলে সাধের জঙ্গলবাড়ি অচিরে ছারখার হইয়া যাইবে। এই সমস্ত ভাবী বিপদ আশঙ্কা করিয়া নবাব ফিরোজ খাঁ আপনাকে বহু ধন্যবাদ দিয়া যুদ্ধ থামাইয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন। আপনি কে তাহা তিনি চিনিতে পারেন নাই, তবে তিনি মোগলদের প্রাপ্য সমস্ত রাজস্ব দিতে সম্মত হইয়া সন্ধি করিয়াছেন। উমর খাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল, তাঁহার কন্যা সখিনাকে লইয়া। এই দেখুন, ফিরোজ খাঁ সখিনাকে তালাক-নামা দিয়াছেন, তাহা আমার সঙ্গেই আছে, ইহাতে উমর খাঁ খুসি হইয়াছেন—যুদ্ধের প্রধান কারণ মিটিয়া গিয়াছে।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে সখিনার মুখ কমল একবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, মুহূর্ত্ত কাল তিনি স্বামীর তালাক-নামা খানি দেখিলেন—তাহাতে অঙ্কিত নবাবের হস্তের পাঞ্জা ও মোহর চিহ্নের উপর চোখ বুলাইয়া লইলেন,—সেই তালাক-নামার কথাগুলি যেন তাহার অস্থি-পঞ্জর ভেদ করিয়া চলিয়া গেল ; তাহার পরেই সেই ছদ্মবেশিনী ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন,—তাঁহার অসম্বৃত কেশপাশ মুক্ত হইয়া রমণীর ললাট-সুষমা জ্ঞাপন করিল, দেহের আঁটাসাটা পুরুষোচিত বর্ম্ম খসিয়া পড়িল। মস্তকে আবদ্ধ স্বর্ণ তাজ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

"আউলিয়া পড়ে কন্যার দীঘল মাথার কেশ
পিন্ধন হইতে খুলে কন্যার পুরুষের বেশ।"

দুই দিন দুই রাত্রি যে বীর-বেশী নারী অনাহার-অনিদ্রা সহ্য করিয়া শত শত বাণের আঘাতে অবিচল থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। একটি শ্রমের স্বেদ বিন্দু যাহার ললাটে দেখা যায় নাই, স্বামীর সোহাগে ও প্রেমের গর্ব্বে যাহার মৃণালোপম কোমল হস্ত লৌহের মত দৃঢ় হইয়াছিল, তালাক-নামার অক্ষরগুলির আঘাত তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। এত বড় আঘাতের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার প্রাণ বায়ু চলিয়া গেল। তাঁহাকে সৈন্যেরা চিনিতে পারিল, চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উত্থিত হইল। রণ-স্থলে তাঁহার শবের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুলালী ঘোড়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার দুই চোখে অশ্রুধারা।

এই দুঃসংবাদ বিদ্যুতের মত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। বেলা-অবসানে যখন সন্ধ্যা তারা উদিত হইয়া একমাত্র শোকার্ত্ত অশ্রুর ন্যায় দিগ্বলয়ে টলমল করিতেছে, তখন জঙ্গলবাড়ী ও কেল্লা তাজপুরের সমস্ত লোকে একত্র হইয়া সখিনার কবরের নিকট বিষন্ন মুখে সমবেত হইয়াছে।

কেল্লা তাজপুরের মাঠ এখনও বুঝি আছে, সেখানে দিবা রাত্রি বাতাস হুহু করিয়া বহিয়া এক মহাশোকের বার্ত্তা ঘোষণা করে। সখিনার জন্য কোন সমাধি মন্দির উঠে নাই, কিন্তু তাহারই নাম স্মরণ করিয়া যেন সেইখানে অজস্র অতসী ও কুন্দ কুসুম হইতে অশ্রু বিন্দুর ন্যায় শিশির বিন্দু ঝরিয়া সমাধির উপর পড়ে; এখনও চন্দ্রের শীতল জ্যোৎস্না সেই কবরের রন্ধ্র-পথে প্রবেশ করিয়া অশরীরী সাধ্বীর জ্বালা জুড়াইয়া দেয়—এবং ঝড় বৃষ্টি সর্ব্বত্র লীলা করিতে

করিতে সখিনার কবরের পার্শ্বে আসিয়া স্তম্ভিত হয়। এই ঐতিহাসিক রমণীর স্মৃতি রক্ষার্থে তাহার দেশবাসীরা এখন পর্য্যন্ত কিছুই করে নাই।

তারপরও বহুদিন এক ফকির এই অসহনীয় শোক ভুলিতে পারেন নাই ; তরুণ রাজকুমার সখিনার জন্য একদিন কপট ফকির সাজিয়াছিলেন, আজ সখিনার বিরহ তাঁহাকে সত্য সত্যই প্রেমের ফকির সাজাইয়াছে। যে আঘাত হানিয়া তিনি অতর্কিতে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুর্ল্লভ বস্তুটি হারাইয়াছেন, আজ সেই আঘাত তিনি নিজে পাইয়াছেন—তাহাতে তাঁহার হৃদ্‌পঞ্জর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, মৃত্যু হইলে বুঝি প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হইত না।

ভেলুয়া

(১)

চট্টগ্রাম মহিষখালি দ্বীপের অন্তর্গত শাফ্লাপুর এখনও বিদ্যমান। এককালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। সম্রাট হুসেন-সাহের পুত্র নসরত সাহের রাজত্ব কালে এই বন্দরের মালিক ছিলেন, মানিক নামক এক মুসলমান সদাগর। তখন শত শত ডিঙ্গা এই স্থান হইতে সমুদ্রে যাত্রা করিত,—বড় বড় জাহাজ ফেনিল তরঙ্গ কাটিয়া হুঙ্কার শব্দে বিদেশী মাল লইয়া এই বন্দরে নঙ্গড় করিত। এক সময়ে পর্ত্তুগিজ জলদস্যুগণ শাফ্লাপুর বন্দরে বড়ই দৌরাত্ম্য করিত।

বন্দরের মালিক মানিক সদাগরের আমির নামক অতি সুদর্শন ও গুণবান্ একটি পুত্র ছিল। ষোড়শ বর্ষ বয়সেই সে "চোদ্দ এলেম" শিখিয়াছিল, কোরাণে তাহার বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল এবং অস্ত্র-বিদ্যায় সে পারদর্শী হইয়াছিল।

এই সময়ে সে একদা সমুদ্রের পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলে নৌকা-যোগে শিকারে যাইতে চাহিল। মাতা প্রাণপ্রিয় পুত্রকে বিঘ্নসঙ্কুল জঙ্গলে যাইতে দিতে সহজে সম্মত হইলেন না, তিনি দ্বিধা বোধ করিলেন। কিন্তু আমিরের পিতা ছেলের পুরুষোচিত উদ্যমে বাধা দিলেন না।

"কালাধর" নামক বৃহৎ জাহাজখানিতে চড়িয়া আমির শিকারে

চলিলেন। বৃদ্ধ গরলধর মাঝির নেতৃত্বে জাহাজখানি খালাসী, টেণ্ডল প্রভৃতি লোকেরা বাহিয়া চলিল।

"বাও বাও বলি দিল নাগড়ায় বাড়ি।
লঙ্গর তুলিয়া পরে ডিঙ্গা দিল ছাড়ি॥"

তরুণ আমির-সদাগরের জলন্ত উৎসাহ। যদিও বৃদ্ধ মানিক সদাগর গরলধর মাঝিকে আদেশ করিয়াছিলেন, যে ডিঙ্গাখানি ঝড়ের মুখে পড়িলে যেন মধ্য গাঙ্গের দিকে না যায়, তথাপি সেইরূপ এক সময় আমির উত্তাল তরঙ্গমালার নর্ত্তন দেখিবার কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়া মাঝিকে নৌকা মাঝ-দরিয়ার দিকে লইয়া যাইতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। মাঝি অনিচ্ছা সত্বেও প্রভুর আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইল।

হু হু করি ছুটিল বাতাস পালেতে পৈল টান।
পরিচয় না রইল ভাটা কি উজান॥
এক ঢেউএ উঠে যে ডিঙ্গা আকাশ বরাবর।
আর ঢেউএ যায়রে ডিঙ্গা পাতালের ভিতর॥"

ডিঙ্গাখানি ভীষণ আবর্ত্তে কুমারের চাকের মত ঘুরিতে লাগিল।

"আমির সাধু বলে, এইবার পৌছিলে নোকানে
হাজার সিন্নি দিব আমি গাজিপীরের নামে।"

(২)

পুঞ্জীভূত কোয়াসার মত অদূরে পাহাড়ের শৃঙ্গ দেখা যাইতে লাগিল ; ডিঙ্গা সেইখানে লঙ্গর করিলে আমির সদাগর তটে অবতরণ করিলেন। তখন সমস্ত উপত্যকাভূমি বিবিধ ফুল সম্ভারে বিচিত্র হইয়া আছে, নীল আকাশে শুভ্র শেফালিকার ন্যায় পায়রার ঝাঁক বাতাসে উড়িয়া খেলা করিতেছে, আমির এইগুলি ধরিতে উৎসাহী হইলেন। এই পায়রাগুলির মধ্যে একটি অতি সুদৃশ্য পোষা পায়রা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পায়রাটির কণ্ঠস্বর মানুষের মত, সে কোরাণের বয়েৎ আবৃত্তি করিয়া ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যে করিয়াই হউক, পায়রাটিকে ধরিতে হইবে। কিন্তু পাখীটি বড় চতুর, গরলধর মাঝি গাছে গাছে আঁটা লাগাইয়াছে এবং ডিঙ্গি হইতে জাল আনিয়া নানা কৌশলে তাহা উপযুক্ত স্থানে পাতিয়াছে, কিন্তু পায়রা তাহা অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত এড়াইয়া যাইতে লাগিল ; অগত্যা আমির সদাগর সাবধানে তাহার প্রতি একটি শর নিক্ষেপ করিলেন,—সেই শর পায়রার বক্ষে যাইয়া বিঁধিল। পাখিটি ঘুরিতে ঘুরিতে একটি বায়ুচালিত স্থল-পদ্মের ন্যায়—দূরে তাহার পালয়িত্রী ভেলুয়ার ক্রোড়ে যাইয়া পড়িল।

শঙ্খনদী ও সাগরের মোহনায়, তেলেঙ্গাপুর নামক একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। সাত পুত্র ও এক কন্যা লইয়া সোনাই বিবি সেই নগরীতে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কন্যাটির নাম ভেলুয়া।

সমুদ্রের তীরে এই সুন্দরী কিশোরীর জন্য একটি উচ্চ টাঙ্গী ঘর নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গ্রীষ্মকালে এই মন্দির বড়ই আরামের ছিল, ইহার উচ্চতা ছিল প্রায় ১০০ হাত।

সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা ভেলুয়া এই টাঙ্গীতে সমুদ্রবায়ু উপভোগ করিতে-ছিলেন, সহসা তাঁহার আদরিণী হিরণী কপোত শর-বিদ্ধ হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া পড়িল। তাঁহার বড় সোহাগের পায়রা হিরণীর মুমূর্ষ অবস্থা দেখিয়া ভেলুয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভাইদের কাছে সংবাদ পৌছিল, "যে আমার হিরণীকে মারিয়াছে, আমি তাহার মৃতদেহ দেখিতে চাই"—ভেলুয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাইদিগকে এই সঙ্কল্প জানাইল।

ভ্রাতারা ক্রুদ্ধ হইয়া আমিরের ডিঙ্গাখানি বহু লোকজনের দ্বারা ঘিরিয়া ধরিলেন এবং আমিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের প্রাসাদের এই পোষা পায়রাকে কে হনন করিয়াছে? আমির বলিলেন, "আমিই এই কাজ করিয়াছি, তজ্জন্য দোষ [illegible]র করিতেছি, এ জন্য খেসারত যাহা চাহিবেন তাহা দিব, এক পাখী বই তো নয়, এজন্য এভাবে চোখ রাঙ্গাইতেছেন কেন?"

—ভ্রাতারা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ইনি কত বড় বাদসাহ! "খেসারৎ দিবেন, খেসারৎ তোমার জান্।"

আমিরও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; তাহার উদ্ধত উত্তরে ভ্রাতারা বিষ[illegible] বিরক্ত হইয়া হাত পা' বাঁধিয়া তাহাকে প্রাসাদ-লগ্ন কারাগা[illegible] লইয়া গেলেন এবং সেইখানে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়া ভগীকে সংবাদ দিলেন; ভেলুয়া সন্তুষ্ট হইল।

(৩)

ক্ষুদ্র কারাগারে শৃঙ্খলিত অবস্থায় নিদারুণ পীড়নে অস্থির হইয়া আমির মৃদুস্বরে বিলাপ করিয়া কাঁদিতেছিলেন। স্বর্ণ-পাদুকা পরিহিতা একটি পক্ক আমের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট বৃদ্ধা সোনাই বিবি এই অতি সুদর্শন বালকের বিলাপোক্তি শুনিয়া বন্দীশালার দ্বারে আসিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানালেন,—শাফল্যা বন্দরে তাঁহার ভগিনী মোনাই বিবির বিবাহ হইয়াছিল, আমির তাহারই ছেলে। তখন তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং প্রহরীদিগকে আদেশ করিয়া তাঁহার বন্ধনমোচন করাইলেন। আমির সুবাসিত জলে স্নান করিয়া সোনাই বিবির পুত্রদের আপ্যায়নে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে একত্র নানা সুখাদ্যে তৃপ্ত হইলেন এবং স্বর্ণপালঙ্কে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সোনাই বিবি পুত্রদিগকে বলিলেন, "আমার ভগিনী মোনাই বিবির সঙ্গে আমার বাল্যকালের একটা প্রতিশ্রুতি আছে। তাঁহার পুত্র হইলে এবং তৎপর আমার যদি কন্যা হয়, তবে আমরা দুইজনের বিবাহ দিব। আমির যেমনই সুন্দর, তেমনই গুণশীল। সুতরাং আমার ভেলুয়াকে ইহার হস্তে দিব। তোমরা বিবাহের উদ্যোগ কর।" মহা আনন্দে ভ্রাতাগণ বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

ইহার মধ্যে ভেলুয়া শুনিল, এক তরুণ বণিককে বন্দী করা হইয়াছে। সে-ই তাহার হিরণীকে হত্যা করিয়াছে। ভেলুয়ার ক্রোধের নিবৃত্তি হয় নাই। সে তাহার এক সহচরীকে আদেশ করিল, যে হাতে এই সদাগর তাহার আদরের হিরণীর প্রাণ নিয়াছে, সেই হাতের পাঁচটি আঙ্গুল এখনই যেন কাটিয়া তাহার নিকট আনয়ণ করা হয়।

"দেখিয়া আসবে বহিন কেমন সদাগর।
কোন্ হাতে মারিল আমার হিরণী কৈতর॥
সেই হাতের আঙ্গুল কাটি আনিবা এখন।
হিরণীর শোক তবে হব পাসরণ।"

সহচরী তাহার কর্ত্রীর এই আদেশ তামিল করিতে যাইয়া গোপনে শুনিতে পাইল, ভেলুয়ার সঙ্গে বন্দী সদাগরের বিবাহের প্রস্তাব স্থির হইয়া গিয়াছে। উঁকি মারিয়া দেখিল,—সহস্র মুদ্রা মূল্যের এক জরোয়া তাজ মাথায় পরিয়া কাশ্মিরী শাল ও অন্যান্য বহুমূল্য সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আমির সদাগর রূপ ও বেশের জাঁকালো সজ্জায় ঝলমল করিতেছেন।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সে ভেলুয়ার কক্ষে আসিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "বিবি সাহেবা! আশ্চর্য্য! বন্দী সদাগরের দক্ষিণ হস্তে একটি আঙ্গুলও নাই। আল্লা তাঁহাকে আঙ্গুলহীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন আঙ্গুলহীনের আঙ্গুল কি করিয়া কাটিব।" পুনরায় ঈষৎ হাসিয়া সহচরী প্রস্থান করিল।

"শুন কন্যা খোদাতালার ভুল।
সদাগরের হাতের মাঝে নাইরে আঙ্গুল
খল খল হাসি দাসী যায় গড়াগড়ি।
কথার মর্ম্ম না বুঝিল ভেলুয়া সুন্দরী

(৫)

পরমাসুন্দরী ভেলুয়াকে এইবার বিবাহের জন্য প্রস্তুত করা হইল; তাঁহার মুক্তার মত দাঁতগুলিতে মিশি লিপ্ত করা হইল; চুলগুলি আবের চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া খোপা বাধা হইল এবং খোপার উপর মণি মুক্তার ছড়া জড়াইয়া দেওয়া হইল। গলায় হাঁসুলি ও মণি-মুক্তা গ্রথিত হার শোভা পাইল। ভেলুয়া নাকে নাকফুল এবং কর্ণে কর্ণ ফুল (মাকড়ি) পরিল। বাজুবন্ধ ও কঙ্কণে করদ্বয় সুশোভিত হইল! চোখে অঞ্জন দিয়া, সিঁথিতে সিঁথি পাটী পরানো হইল। দুই পায়ে সোনার ঘুঙ্গুর ও নূপুর বাজিয়া উঠিল।

"সাজিয়া কন্যা ধীরে বাড়ায় পা
রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু অলঙ্কারের রা।"

শ্বাশুড়ি অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া আমিরের ডিঙ্গিতে ভেলুয়াকে উঠাইয়া দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিলেন।

আমির সদাগরের বড় ভগিনীর নাম বিভলা; তাহাকে কৃশ বলিলে ঠিক বুঝান যায় না; তাহার গায়ে কতকগুলি হাড়,—চামড়ার দ্বারা আবৃত। দেহে রক্তের লেশ নাই, পাণ্ডু বর্ণ; তাহার

হাত ও পায় পুরুষের মত রোম রাজি, ২০ বৎসর, বয়স, তথাপি শরীরে নারীজনোচিত কোন লক্ষণ নাই। বড় বড় দুটি চোখ কঙ্কাল-সার মুখের মধ্যে অস্বাভাবিক রূপ উজ্জ্বল। সেই সংসারে এমন কেউ নাই, যাহার সঙ্গে বিভলা ঝগড়া না করিয়াছে। একটি কথা বাদ যায় না, প্রত্যেকটি শব্দের নানারূপ কুটিল অর্থ করিয়া সে সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে। সে শুধু তাহার মাতার অংশীদার। ভেলুয়া আসিয়া আসমানের পরীর ন্যায় মাতার আদরের অংশীদার হইয়াছে—এই দুঃখে সে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

দিন রাত্র আমির ও ভেলুয়া আনন্দ-হিল্লোলে ভাসিয়া বেড়ায়, বিভলার কলিজা হিংসায় ফাটিয়া যায়; সে সদা সর্ব্বদা মাকে কি বুঝায়। যে মাতা আমিরকে চোখে হারাইতেন, বধুর প্রতি বাড়াবাড়ি অনুরাগ দেখিয়া তিনিও তাহার প্রতি কতকটা বিরূপ হইলেন এবং নিরবধি কন্যার মন্ত্র তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়াতে তাঁহার মন আর পুত্রের প্রতি অনুকূল রহিল না। একদিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "গরলধর ও অপরাপর মাঝিরা রাতদিন ঘুমাইয়া থাকে—অথচ যথা সময় বেশী বেশী বেতনের দাবী করে, ডিঙ্গিগুলি জলে থাকিয়া শেওলা ধরিয়া গিয়াছে। ঘাটে ঘাটে মাল প[illegible] নষ্ট হইয়া যাইতেছে,—বসিয়া খাইলে বাদশাহের ধন ফুরাইয়া যায় [illegible] জন্যই লোকে বলে স্ত্রীর বশীভূত হইলে পুরুষের ভিতর আর [illegible] থাকে না। পিতৃ ধনের গর্ব্ব যে করে, সে পুত্র কাপুরুষ। তুমি তোমার সাহস-বীর্য্য সব খোয়াইয়াছ। অন্দরে স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া বসিয়া আছ, তোমাকে ধিক্।"

(৬)

মায়ের এই কথায় আমিরের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এই মা তো সেদিন পর্য্যন্ত তাহার ঘরের বাহির হইতে শুনিলে দুর্ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিতেন। তাঁহার চক্ষে এখন আদরের ছেলের একটু সুখ-ভোগ সহ্য হয় না।

কতক্ষণ মাথায় হাত দিয়া তিনি বিষণ্ণ মুখে কি ভাবিতে লাগিলেন।

তার পর উঠিয়া আসিয়া গরলধর মাঝিকে আদেশ করিলেন; জাহাজগুলি প্রস্তুত কর, "কালই আমি বাণিজ্য করিবার জন্য সমুদ্র যাত্রা করিব।"

মাতার কথার ইঙ্গিতে তাঁহার সর্ব্বশরীর যেন অপমানে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করিল।

পর দিন যখন ভেলুয়া নানারূপ কারুখচিত স্বর্ণপাত্রে তাঁহার প্রাতরাশের জন্য খোরমা, খেজুর, বাদাম ও কিসমিস লইয়া উপস্থিত হইল—দুধকমল চাউল চিনি দুধ ও ডাবের জলে সিদ্ধ করিয়া পরমান্ন প্রস্তুত করিল—ও খাওয়ার জন্য মিনতি করিল, তখন দেখিল আমিরের দুটি সুন্দর চক্ষু কাঁদিয়া ফুলিয়া গিয়াছে, তাঁহার মুখখানি শ্বেতপদ্মের মত ছিল, তাহাতে কালিমার ছায়া পড়িয়াছে।

আমির বলিল "মা আমায় ভর্ৎসনা করিয়াছেন; দিদি ঝাঁটা মারিতে বাকি রাখিয়াছেন। পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছি, আমি বাড়ীর

সঞ্চয় নষ্ট করিব, এক পয়সা উপার্জ্জন করিব না। আমার জীবনের উপর ধিক্কার জন্মিয়াছে, আমি কালই বাণিজ্যে যাইব।"

পরমান্ন শুদ্ধ সোনার বাটী মাটিতে পড়িয়া গেল, ভেলুয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "আমি এ বাড়ীতে তোমাকে ছাড়া থাকিতে পারিব না। তুমি আমাকে লইয়া চল।" স্বামী তাহাকে কত আদর করিলেন এবং বলিলেন, "আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব এবং তোমার সঙ্গে চিরকাল একত্র থাকার ব্যবস্থা করিব, কিন্তু আজ প্রসন্ন হইয়া আমায় বিদায় দেও, আমি বড় অপমান ও ব্যথা পাইয়াছি।"

এই বলিয়া সোনার বাটা হইতে পান তুলিয়া লইলেন এবং আদরে ভেলুয়াকে একটি খিলি দিয়া নিজে একটা খাইলেন। তাঁহার আদরে কৃতার্থ হইয়া গলদশ্রুনেত্র বধূ তাঁহাকে বারবার প্রণাম করিল। নিজের একবিন্দু উদ্গত অশ্রু মুছিয়া তিনি বাড়ীর সকলের নিকট বিদায় লইয়া ডিঙ্গিতে উঠিয়া বসিলেন।

(৭)

ঘোর কোয়াসায় দিক্ ভুল হইল। সেই ঘনীভূত অন্ধকার ঠেলিয়া গরলধর চারিদিন পরে এক বন্দরে ডিঙ্গি নঙ্গর করিলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী এক নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ স্থানের নাম কি?' সেই নাবিক এক গাল হাসিয়া বলিল, "গরলধর, তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে নাকি, তুমি শাকল্যা বন্দরে নিজের বাড়ীর ঘাট চিনিতে পারিতেছ না?"

মাঝি বুঝিল—"কোয়াসার ঘোরে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া সে চারিদিন উল্টা দিকে ডিঙ্গি বাহিয়া ফিরিয়া তাহার নিজ পল্লীতে আসিয়াছে। আমির সদাগর এই সুযোগে যাইয়া নিশাকালে ভেলুয়ার সঙ্গে সঙ্গোপনে আর একবার দেখা করিয়া আসিল। তাহার স্ত্রীর মুখে জানিতে পারিল, বিভলা তাহার প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছে, তাহাতে তাহার জীবন অসহ্য হইয়াছে। "তোমার পায়ে ধরি আমাকে লইয়া যাও,—আমরা দুইজনে দেশান্তরে যাইব। তুমি যদি নিঃস্ব হও, তবে আমি হাতের বাজু বেচিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব! আমরা বিদেশে যদি বিজন জঙ্গলে থাকি, আমি আমার গলার স্বর্ণ হার বেচিয়া তোমায় খাওয়াইব। আর এই দুঃখের বাণিজ্য-যাত্রার প্রয়োজন নাই। নদীর তীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকিব। আমার হাতের দুটি কঙ্কণ বেচিয়া খাইব। গলার হাসুলী ও কর্ণের সোনা বিক্রয় করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিব। যখন সব ফুরাইয়া যাইবে, তখন এই সোনার ফুলওয়ালা, মূল্যবান শাড়ী ও সোনার চাদর বিক্রয় করিয়া কিছু দিন চলিবে।"

কাঁদিতে কাঁদিয়া ভেলুয়া এই কথা গুলি বলিল এবং কাঁদিতে তাঁহাকে খোরমা-বাদাম খাইতে দিল।

আমির সদাগর বুঝিলেন, যে দুঃখে ভেলুয়া এইকথা গুলি বলিয়াছে তাহা সামান্য নহে,—তথাপি তাহাকে লইয়া যাইবার সাহস তাঁহার হইল না। এক হস্তে স্ত্রীর চক্ষের জল মুছাইতে মছাইতে অপর হাতে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া তথাকার হাহাকার থামাইতে থামাইতে সে ডিঙ্গার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

(৮)

"ঘাটেতে আসিয়া আমির ডাকে মাঝি মাল্লা।
কেহ লয় বদরের নাম কেহ বলে আল্লা।"

এদিকে গোপনে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমির সদাগর চলিয়া আসিলে—বিভলা নানা কারণে সন্দেহ করিল, ভেলুয়া কোন পুরুষের সঙ্গে তাহার কক্ষে কথাবার্ত্তা বলিয়াছে। সে যে তাহার স্বামী এবং বিভলার ভাই,—ইহা সে জানিতে পারে নাই। পরদিন সে তাঁহার ভ্রাতৃবধূর নামে নানা কলঙ্ক রটাইয়া দিল।—পাড়ায় ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিল এবং সাধ্বী ভেলুয়ার বিরুদ্ধে গ্রামবাসী উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

একেইত আমিরের প্রবাস যাত্রার পর ভেলুয়ার উপর বিষম অত্যাচার চলিতেছিল, এই ঘটনার পর সেই অত্যাচার শত গুণ বাড়িয়া চলিল। বিভলা তাঁহার হাতের বাজু, গলার হার, অগ্নি-পাটের শাড়ী, হস্তের কঙ্কণ এই সমস্তই খুলিয়া লইল, এবং পরে তাহাকে উঠান ঝাড় দেওয়া, নদী হইতে জল দিয়া আঙ্গিনা মার্জ্জনা করিতে বাধ্য করা হইল। একদিন সে সাড়ে তিন সের লঙ্কা বাটিতে বাধ্য হইল। সেই লঙ্কা বাটার ফলে তাহার হাতে ফোস্কা পড়িল তাহার যে ভীষণ জ্বালা-পোড়া আরম্ভ হইল তাহাতে সে নদীতে ঝাপাইয়া পড়িল। বিভলা তাহাকে খাইতে দিত না। ঘরের আঙ্গিনায় পড়িয়া থাকিলে সে তাহার চুল ধরিয়া উঠাইয়া লাঞ্ছনা করিতে থাকিত।

কখনও নদীর তীরে ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিয়া সে পাগলীর মত ঘুরিয়া বেড়াইত ও বারমাসী গান গাহিয়া মনকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিত। কখনও কখনও উড়ন্ত পাখীগুলিকে দেখিয়া তাকাইয়া থাকিত। 'হায়! আমি যদি ঐরূপ আকাশে বুক বিচরণ করিতে পারিতাম, তবে বুঝি মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিতাম!' স্বামীর জন্ম তাঁহার প্রাণ রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠিত, চক্ষু ছাপিয়া অশ্রু পড়িতে থাকিত, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে গাহিত,

"ভরা গাঙ্গে যখন আমি জল আনিতে যাই।
তোমার ডিঙ্গা আইল বলে ফিরে ফিরে চাই॥"

মাঘ মাসের শীতে ছিন্ন কাঁথা খানি চক্ষের জলে ভিজিয়া যায়, খড় কুটার আগুন চোখের জলে নিভিয়া যায়, ভেলুয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর কথা স্মরণ করে।

হায়! চাঁদ সুরুজ আমার মুখ দেখিতে পাইত না, সেই আমি বনে জঙ্গলে অরক্ষিত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াই। যে অঙ্গে আতর গোলাপে সুবাসিত থাকিত—তাহা এখন ধুলি বালি মাখা, যে শরীর স্বর্ণ পালঙ্কের উপর থাকিত, তাহা গোয়ালঘরের এক কোণে পড়িয়া থাকে—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ভেলুয়া স্নান করিবার জন্ম নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। নিদারুণ নদীর দুর্দ্দমনীয় স্রোত তাহার মুক্ত চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, বহু কষ্টে এই স্রোত হইতে নিজের শরীরকে উদ্ধার করিয়া সে তটভূমির উপর আছাড় খাইয়া পড়ে।

(৯)

ভোলা সদাগর কাটনী গ্রামের এক মস্ত বড় ধনী বণিক। সে তাঁহার বহুমূল্য মাল ও পণ্য লইয়া মঙ্গলিবন্দরে গিয়াছিল. বহু অর্থ লইয়া সে শাফলা বন্দরে আসিয়া তাহার ঘাটে ডিঙ্গা নঙ্গর করিল।

সে নৌকা হইতে দেখিল, কুহেলি-জড়িত প্রভাত সূর্য্যের রশ্মি যেরূপ আঁধার ভেদিয়া দৃষ্টিপথে পতিত হয়, নদীর ঘাটে রূপসী ভেলুয়ার রূপ তথা হইতে তেমনি ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

ভোলা সদাগর জোর করিয়া ভেলুয়াকে তাহার ডিঙ্গিতে লইয়া আসিল এবং বলিল, "আমি ভোলা সদাগর, তোমার স্বামী আমিরের শৈশব-বন্ধু, আমরা উভয়ে মঙ্গিলাবন্দরে গিয়েছিলাম— আমির আমার প্রাণে বড় দাগা দিয়া সেইখানে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে। আমরা তাহার মাতাকে খবর দিয়া আসিয়াছি। এখন ভেলুয়া তুমি আমাকে নিকা কর, আমি তোমাকে লক্ষ টাকার শাড়ী ও লক্ষ টাকার জহরত দিব। তুমি আমার গৃহে এস। শত শত পরিচারিকা তোমার পদসেবা করিবে, কেহ মুক্তার হার দিয়া তোমার বেণী বাঁধিবে, কেহ তোমার গায়ে সুগন্ধি গোলাপের আতর মাখাইবে, কেহ তোমার পদে স্বর্ণমঞ্জীর পরাইয়া আলতায় লাল করিয়া দিবে।

এই বিপদে পড়িয়া ভেলুয়া ছলনা করিতে বাধ্য হইল, বলিল— 'তুমি আমাকে ছুঁইও না।'

"আমার কাছে যাহা চাও তাহা দিব নিকা হৈলে পরে।"
"খুসি হয়ে দুষ্ট ভোলা দাড়িতে হাত বুলায়।
ঘন ঘন ভেলুয়ার মুখের দিকে চায়।"

ভেলুয়া বলিল,"পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া খোদার নাম লইয়া শপথ কর। ছয় মাস কাল তুমি আমার নিকটে আসিবে না এবং এমন ব্যবস্থা করিবে যেন কোন পুরুষ যেন এই সময়ের মধ্যে আমার নিকট না আসে ও কেহ স্পর্শ না করে।"

এই ছয়মাস গতে তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।

ভোলা তাহাই স্বীকার করিল। ভেলুয়া তো আমার আবাসেই বন্দী হইয়া থাকিবে, এই ছয়মাসের মধ্যে আমি ইহার জন্য আমার বাড়ীতে দীঘির পাড়ে মস্ত বড় এক জলটুঙ্গী ঘর নির্ম্মাণ করিব এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে সেখানে যাইয়া তাহাকে নিকা করিয়া বাস করিব।

ভোলা নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেল। ভেলুয়া ভাবিল, সত্যাই কি আমার স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন? কই আমার অন্তরে তো তাঁহার মৃত্যুর ছায়া পড়ে নাই! আমার স্বামীর যদি কোনরূপ অমঙ্গল হইত, তবে আমার সিঁথির সিন্দুর মলিন হইয়া যাইত— আমার বুকের মধ্যে পঞ্চ প্রাণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিত। অমঙ্গল হইলে আমার চক্ষু দুটি ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিত। দুষ্ট ভোলা নিশ্চয়ই আমাকে প্রতারণা করিয়াছে।"

এমন সময় ভোলা সদাগর তথায় উপস্থিত হইয়া পুনরায় প্রীতি-

প্রদ ও প্রলোভনসূচক কথা বলিতে লাগিল। তখন দীপ্তনয়না ভেলুয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "আমার আঁচলে বিষ বাঁধা আছে, তুমি যদি আমার কথা পালন না কর এবং আমাকে বিশ্বাস না ক[illegible] আমি বিষ খাইয়া মরিব।" এই কথায় ধীর পাদ[illegible]ভোলা সেখান হইতে চলিয়া গেল।

(১০)

এদিকে আমির সদাগর বহু স্থানে বাণিজ্য করিয়াছে, যেখানে গিয়াছে সেখানে যেন তাহার লাভের গাঙ্গে জোয়ার আসিয়াছে—প্রত্যাশার অতীত অর্থ পাইয়াছে। উজানী নগরে বাণিজ্যে বহু লাভ করিয়া মছিলাবন্দরে আসিয়া তাহার ভাগ্যশ্রী আরও বাড়িয়াছে। ধন ও নানা জহরত ও দ্রব্যাদি লইয়া ডিঙ্গিগুলি হংসরবে সমুদ্র ফেনা কাটিয়া বহুদিন পরে আজ শাফল্যা বন্দরে তাহার নিজের ঘাটে পৌঁছিয়াছে।

তাহার ধন-দৌলত ডিঙ্গি হইতে উত্তোলিত হওয়ার সময় ডঙ্কার শব্দে নগরীটি যেন জাগ্রত হইয়া উঠিল, বহুলোক তাঁহার সঙ্গে [illegible]খা করিতে আসিল। সে বাড়ীতে আসিয়া প্রথমই দেখিতে [illegible]ল তাহার দিদি বিভলাকে।

সে বিনাইয়া বিনাইয়া তাঁহার নিকট ভেলুয়ার কুকীর্ত্তি বর্ণনা করিতে লাগিল, তাহার কল্পিত সেই কাহিনী যে ভিত্তিহীন এবং অতিশয় মিথ্যাসম্পূর্ণ, সদাগরের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

তিনি উচ্চৈস্বরে তাহাকে বারংবার বলিতে লাগিলেন—"আমার ভেলুয়া কোথায়? বিভলা ভয় পাইল না, সে বলিল, "তিন দিন পূর্ব্বে সে মরিয়াছে, পরমা সুন্দরী ও গুণবতী এক কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব, তুমি নূতন বৌ আনিয়া সুখে গৃহস্থালী কর।" সদাগর চীৎকার করিয়া বলিল—"আমার প্রাণের ভেলুয়াকে কোথায় কবর দিয়াছ?" বিভলা বলিল, "তিন দিন পূর্ব্বে তাহাকে নদীর ঘাটে কবর দেওয়া হইয়াছে।"

উন্মত্তের মত সদাগর সেই কবরের উদ্দেশে ছুটিল। নির্দ্দিষ্ট স্থান খুঁড়িয়া তিনি ভেলুয়ার পরিবর্ত্তে পাইলেন একটি মৃত কাল কুকুরের দেহ।

আমির ভগিনীকে কিছু বলিলেন না, মাতা-পিতাকে কিছু বলিলেন না। মাথার জরির টুপি ও পরিধানের রেশমী লুঙ্গী খুলিয়া ফেলিলেন—একটা মলিন ছেঁড়া লুঙ্গী পরিয়া ছেঁড়া টুপি মাথায় দিয়া উন্মত্তের বেশে আমির বনে-জঙ্গলে ছুটিয়া গেলেন। তাঁহাকে আর কেহ খুঁজিয়া পাইল না।

বনের ফকির কাঁদিতে কাঁদিতে বনে চলিয়াছেন, ভেলুয়ার জন্য তাহার মন প্রাণ অস্থির হইয়া আছে। সেই জঙ্গলেভরা পাহাড়িয়া দেশে তিনি শঙ্খ নদী সাঁতারিয়া পার হইলেন, অতি দুর্গম প্রদেশ, নদী পার হইয়া তিনি ধোঁয়ার মত দৃশ্যমান "কুড়ালিয়া মুড়া" নামক গিরিশৃঙ্গের সন্নিহিত হইলেন। সেইখানে দুইটি নির্ঝরধারা দুই দিকে ছুটিয়াছে—তথা হইতে আরো পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়া প্রেমের ফকির কাউখালি পার হইয়া নানা কষ্ট ভোগ করিয়া ইছামতীর মুখে

আসিলেন। তখন তাহার জল-সিক্ত দেহ শীতে অনশনে ও অনিদ্রায় থর থর কাঁপিতেছিল। নানা দুঃখ কষ্ট সহিয়া ফকির রগঙ্গা পরগণায় সৈদগ্রামে প্রবেশ করিলেন, সেখানে টৌনাবাঈই নামক এক প্রসিদ্ধ গুণী ব্যক্তি বাস করিত। ফকির তাহার কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

(১১)

অসাধারণ সারেঙ্গা বাদক বলিয়া সেই অঞ্চলে তাহার খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা ছিল। তাহার হাতে সারেঙ্গা বাজিলে গাঙ্গের ঢেউ উজান বহিত, দুর্দ্দান্ত বাঘ পোষ মানিত এবং বনের হরিণীর দুইটি আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষে অশ্রু টলমল করিত। এমন কি উদ্যত ফণা বিষধর সেই সারেঙ্গের সুরে মাথা নত করিত। কাটুনী নগরের নিকট সৈদপুরের গ্রামে, এখনও একটা ভিটা পড়িয়া আছে। লোকে তাহাকে টোনা বাঈইর ভিটা বলে। শত শত বৎসর পরে ঐ অঞ্চলের লোকেরা এখনও তাহাকে ভুলিতে পারে নাই।

ইতর জীবজন্তু যাহার দৈবী শক্তি দেখিয়া সারেঙ্গের গান শুনিয়া ছুটিয়া আসে,—মর্ম্মান্তিক কষ্টে জর্জ্জরিত আমিরের চিত্ত যে সেই মিষ্ট রবে অভিভূত হইবে—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমির ফকির অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে টৌনাবাঈই'এর নিকট তাহার প্রাণের ব্যথা খুলিয়া বলিল। সেই দুঃখের কাহিনী শুনিয়া সারেঙ্গা বাদকের প্রাণ ফকিরের জন্য ব্যথিত হইল। সে বলিল,

"তুমি আমার সাকরেৎ হও, আমি তোমাকে সারেঙ্গা বাজাইতে শিখাইব, দেখিবে এই সারেঙ্গাই তোমার হৃদয়ে শান্তি দিবে, তোমার মন আর এরূপ তীব্র জ্বালায় জ্বলিবে না।"

ঠিক একটি মাস ভরিয়া টোনাবারুই আমিরের জন্য একটি সারেঙ্গা তৈরী করিল। বৈলাড় নামক পাহড়িয়া অঞ্চলের এক শক্ত অথচ তরল তক্তার যন্ত্রটি প্রস্তুত হইল, সারেঙ্গার বৈলাগুলি মন-পবন গাছের কাঠে নির্ম্মাণ করিয়া দাঁড়-সাপের শিরা দিয়া উহার তার প্রস্তুত হইল। শ্বেত ঘোটকের লেজে ছড়া তৈরী করিয়া গোয়ালি গাছের আঁটা দিয়া যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ আটকানো হইল।—সারেঙ্গাটি দেখিতে অতি সুন্দর হইল।

কিন্তু এখানেই শেষ নহে, তারগুলির অপরূপ সমাবেশে তাহাতে ছড় টানিয়া গেলেই "উহা 'ভেলুয়া' 'ভেলুয়া' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিত, ফকির যখন সারেঙ্গাটি বাজাইত, তখন মনে হইত,—ভেলুয়ার নাম ধরিয়া কেহ অশ্সরীর কণ্ঠে কাঁদিতেছে। সেই বেদনাময় সকরুণ সুর আশে পাশে সমস্ত তরুলতা ও ফুলবনে ঝঙ্কৃত হইত। আমির য[illegible] অশ্রুপূর্ণ চক্ষে কাঁদিতে কাঁদিতে সারেঙ্গা বাজাইয়া পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ থাকিত না, সে একবারে উন্মত্ত হইয়া যাইত।

"সারেঙ্গা বাজায় ফকির চোখের জল ছাড়ি,
পেটে নাই দানা পানি, ফিরে বাড়ী বাড়ী।"
জলে ভিজে, রোদে পুড়ে শীতে কাঁপে গা।
পশ্চিমের পন্থে আইল পাগল ফকিরা।"

সৈদপুর হইতে নানা গ্রাম ঘুরিয়া সে সৈদাবাজ পরগণায় আসিয়া পৌছিল। অদূরে 'মুড়া'র নিকট হইতে নানা সৌধ, মঠ মসজিদ মন্দিরপূর্ণ কাটনি নগরের অট্টালিকা-চূড়া দৃষ্ট হইতে লাগিল।

(১২)

ভোলা সদাগর ভেলুয়াকে নিকা করিয়া সুখে বাস করিবার জন্ত নদীতীরে খুব উচ্চ একটা জলটুঙ্গি ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। বৃহস্পতিবারের পড়ন্ত বেলা ; গৃহ পার্শ্ববর্ত্তী শ্যামবর্ণ তরুগুলির মাথার উপর প্রকৃতি যেন মুঠি মুঠি স্বর্ণ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই গৃহের বারেন্দার উপর ভেলুয়া দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ মনে কি ভাবিতেছিলেন, সেই সময় ভোলা তাঁহার কাছে আসিল !—

"মুখেতে সুগন্ধি পান দাড়িতে আতর।
ধীরে ধীরে আসি ভোলা পশিল অন্দর !"

সে অনুনয়ের সুরে বলিতে লাগিল। "ছয়মাস অপেক্ষা করিয়াছি, কত সহিষ্ণু হইয়া যে আমি এই প্রতীক্ষা করিয়াছি, তাহা আমি তোমাকে কি বলিব, ছয়টিমাস ছয়টি বৎসরের মত দীর্ঘ বোধ হইয়াছে, আজ তোমার নির্দ্দিষ্ট ছয়মাসের শেষ দিন, আমি কাল শুক্রবার দিবসে নিকার দিন ধার্য্য করিয়াছি। তোমার মুখের কথা আমি বিশ্বাস করিয়াছি,—আশা করি, তুমি আমার সঙ্গে ছলনা করিবে না।"

ভেলুয়া ভোলার কথা নত মস্তকে শুনিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমি যে এখনও মন স্থির করিতে পারি নাই, আর কিছুকাল সবুর কর।"

এমন সময়ে গৃহের কাছে সুমিষ্ট সারেঙ্গার সুরের ঢেউ খেলিয়া গেল—সেই সুর যেন পাগল হইয়া 'ভেলুয়া' 'ভেলুয়া' বলিয়া কাঁদিতেছিল; এ যেন সর্ব্বস্বহারা কোন ব্যক্তির প্রাণ-ফাটা কান্না, তাহা কতই করুণ, কতই মিষ্ট এবং কতই মর্ম্মান্তিক! সেই সুর শুনিয়া ভেলুয়া আবিষ্ট হইয়া নিম্নদিকে দৃষ্টি পাত করিয়া সারেঙ্গা-বাদককে দেখিতে পাইল। যদিও তাহার পরণে মলিন ছিন্ন বাস, সে অতি কৃশ হইয়া গিয়াছে, ধূলিবালিতে পিঙ্গল দাড়ি গোঁপে সেই সুকুমার চন্দ্র-বদন আবৃত, তাঁহার মাথায় একটা ছেঁড়া টুপি, তবুও তাঁহার প্রাণের স্বামীকে চিনিতে তাহার মুহূর্ত্ত মাত্র দেরি হইল না, আমির ফকিরও তাহার ফকিরী সাধনার অভিষ্ট ধনকে চিনিতে পারিল; চারি চক্ষু অতি নির্ম্মল মিলনানন্দের সুখময় অশ্রুতে ভাসিতে লাগিল।

ভোলা সদাগরের মন অন্যদিকে প্রলুব্ধ, এমন মিষ্ট সারেঙ্গের আলাপও তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। সে বলিয়া যাইতে লাগিল "খোতবা পড়াইবার জন্য বিবাহের কাজিকে আজই সংবাদ দিয়া রাখি। কাল তোমার মুখের কথা ও বিয়ের দিন ঠিক, দোহাই তোমার একটিবার অনুমতি দাও।"

সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে ভেলুয়া উত্তর দিল, "সে সব পরে হবে, সবুর কর, অত ব্যস্ত কেন?" তাহার মন তখন স্বামীকে দর্শন

করিয়া আনন্দলোকে চলিয়া গিয়াছে, মুখ চোখের বিষণ্ণতা নাই। তার প্রফুল্ল সুকণ্ঠ শুনিয়া ভোলা ভাবিল—তাহার দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে,—আকাশ এখন পরিষ্কার, সে বলিল, "তোমা... অধিক বিরক্ত করিব না,—মনে হইতেছে, তুমি আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছ, দু একদিন দেরী করিতে আমার আপত্তি নাই।"

ভেলুয়া ভোলাকে বলিল,—"ঐ দুঃখী দরিদ্র ফকির বেশ্ সারেঙ্গ বাজায়, ওকে তোমার এই বাড়ীতে একটু স্থান দিও।" ভোলা আনন্দিত হইয়া বাড়ীর নিম্নতলে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ফকিরের রাত্রিবাসের জন্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল।

গভীর রাত্রে যখন শৃগালের সমবেত কণ্ঠরব দ্বিপ্রহর রাত্রির নির্দ্দেশ করিল, তখন ধীর পাদক্ষেপে শয্যা হইতে উঠিয়া ভেলুয়া ফকিরের কক্ষের দ্বারদেশে যাইয়া টোকা মারিল।

ফকির জাগিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া তাহার মানস-দেবতার মূর্ত্তি দেখিয়া চোখের জল নিরোধ করিতে পারিল না। দু... ...টিল পায়রার মত তাঁহারা পরস্পরে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া রহিল, উভ... ...ই কয়েকমাস মাস যত দুঃখ দুজনে পাইয়াছে,—তাহা কাঁদিয়া কা... বলিতে লাগিল। দীর্ঘ বিরহান্তে মিলনের সেই গদ্ গদ্ কণ্ঠের ভ... যে কত মধুর তাহা কিরূপে বুঝাইব? মনে হইল তাহারা স্বর্গের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া সংসারাতীত রাজ্যের সুখ আস... করিতেছে। ভেলুয়া কাঁদিয়া বলিল, ঐ শুন প্রভাতিক কোকিলের সুর শোনা যাইতেছে, এখনই সূর্য্যোদয় হইবে—চল যত শীঘ্র এই নরক হইতে পলাইয়া যাইতে পারি, ততই মঙ্গল।"

আমির বলিল "আমি ভোলার মত চোর নই, চুরি করিয়া তোমাকে আমি নিব না। নিজের ধন কে গোপনে দখল করিতে যায়? বিশেষ আমরা ভোলার গুপ্তচরদের সন্ধানী চক্ষু এড়াইতে পারিব না, তখন নির্য্যাতনের একশেষ হইবে।"

বিষণ্ণ চিত্তে ভেলুয়া চলিয়া গেল। কাল বিলম্ব না করিয়া আমির মুনাপ কাজির কাচারী বাড়ির দিকে রওনা হইলেন।

(১৪)

মুনাপ কাজির বয়স নব্বই বৎসর, তাহার মাড়িতে একটা দাঁতও নাই। যৌবনে লাম্পট্য দোষ ছিল, এখন শক্তি গিয়াছে, কিন্তু লালসা তেমনই রহিয়াছে। আমির তাহার কাছে কাঁদিয়া কাটিয়া আরজি দাখিল করিল, কাজি সমস্ত কথা শুনিয়া ভোলার উপর বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। তখনই পাইক-পেয়াদা যাইয়া ভোলা সদাগরকে আদালতে লইয়া আসিল। ভোলা বলিল, "এ বেটা ফকির মিথ্যাবাদী, সারেঙ্গা বাজাইয়া ঘরে ঘরে বধূদিগকে ফুসলাইবার চেষ্টাই ইহার ব্যবসা, ভেলুয়া আমার স্ত্রী, আপনি সুবিচার করিয়া এই দুষ্ট ফকিরটাকে উচিত শাস্তির আদেশ করুন।"

ভোলা কাটনী নগরের একজন প্রধান ব্যক্তি, সহসা মুনাপ কাজি ফকিরের কথা বিশ্বাস করিয়া একটা হুকুম দিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—'আচ্ছা সেই আওরতকে আমার দরবারে হাজির কর, আমি তাঁহার কথা শুনিয়া বিচার করিব।'

ভোলা বাড়ী যাইয়া ভেলুয়াকে নানারূপ মন্ত্রণা দি[illegible]ন সে সদাগরের পত্নী নয়, এ কথা বলে,—তবে তাহাকে সেই ছিন্নবাস, অনাহারে শুষ্ক ভিখারীটার সঙ্গে যাইতে হইবে, সুতরাং সে যেন ভোলার স্ত্রী এই কথা স্বীকার করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে নিজকে উদ্ধার করে।

ভেলুয়া কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। সদাগর ভাবিল সে তাহার কথায় সম্মত হইয়াছে। সে ভাবিল আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কি ভেলুয়া এই ফকিরটার হাতে যাইয়া পড়িতে স্বীকার করিবে? কখনই নহে।

চৌদোলায় ভেলুয়া আদালতে আনীত হইল।

কর্ম্মচারিবৃন্দ, পাইক-সেপাই ও পেয়াদাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত মুনাপ কাজি নথিপত্র দেখিতেছিলেন, সেইখানে চৌদোলা হইতে ভেলুয়া অবতরণ করা মাত্র, বৃদ্ধ বিচারকের চক্ষু সুন্দরীর রূপের জ্যোতিতে ঝলসিয়া গেল। এমন সুন্দরী সে অঞ্চ[illegible] তিনি দেখেন নাই। কাজী উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহাকে একটি [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন :

"কাজি বলে কহ বিবি ছাড়িয়া সরম।
দোন জনের মধ্যে তোমার কে হয় খসম॥"

অতি ধীর ও স্থির কণ্ঠে নতমস্তকে ভেলুয়া বলিল, "এই ফকিরই আমার স্বামী।"

কাজি গর্জ্জন করিয়া ভোলা সদাগরকে আদালত হইতে বহিষ্কৃত

করিয়া দিলেন। তারপর এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে আমির ফকিরকে ডাকাইয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন :—

মুনাপ কাজি বলিলেন, "ফকির ! ভাল করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, তোমার বিপদ এইখানেই শেষ হইল না। তুমি গরীব ফকির, কিন্তু তোমার স্ত্রী অপূর্ব্ব সুন্দরী। এই আগুন বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা তোমার পক্ষে বাতুলতা মাত্র। তোমার স্ত্রী নিজের আয়ত্তাধীন রাখিতে পারিবে না। আজ আমি ভোলা সদাগরের হাত হইতে ইহাকে রক্ষা করিলাম। কাল আর এক সদাগর আসিয়া ইহাকে টানাটানি করিতে আরম্ভ করিবে। আমার হাতে অনেক গুরুতর মামলা রহিয়াছে। সেই সকল থাকিতে বারংবার তোমার স্ত্রীর মামলা লইয়া আমি ঝঞ্ঝাট পোহাইতে পারিব না। আমি ভেলুয়াকে আমার অন্দরে রাখিতে চাই। সেখানে আমি অতি সাবধানে ইহাকে রাখিব, ভাল খাইবে, ভাল পরিবে, সোনার খাটে শুইয়া থাকিবে। তুমি একেবারে দায়মুক্ত, আর মোকদ্দমার তদ্বির করিতে এখানে আসিতে হইবে না।"

এই বলিয়া কাজি ফোকলা মাড়ি দেখাইয়া হাসিলেন। সেই হাসিতে তাহার মুখ বীভৎস দেখাইতে লাগিল।

ফকির ক্রোধে কম্পিত হইয়া কটূক্তি করাতে কাজির পাইকেরা গলা ধরিয়া আমিরকে ঘরের বাহির করিয়া দিল ; ভেলুয়া কদলী-পত্রের মত সেইখানে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল, স্বামী বিতাড়িত হইলে মূর্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

আমির পাগলের মত ছুটিয়া চলিলেন। বনবাদাড় নদী-নদ-নালা

উত্তীর্ণ হইয়া সে ক্ষিপ্ত গ্রহের মত তিন দিনে স্বীয় পল্লী শাকল্যাবন্দরে যাইয়া তাহার পিতার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন ; ছেঁড়া লুঙ্গীপরা, জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার দেহ, বিশুষ্ক মুখ পুত্রকে পিতা প্রথমতঃ চিনিতেই পারিলেন না।

তারপর তাহার কুলের প্রদীপ, বংশের গৌরব কত সোহাগের আমিরকে যখন চিনিতে পারিলেন, তখন তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমিরের মা মোনাইবিবি অন্দর হইতে বাহির হইয়া পুত্রের এই দশা দেখিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

সকল অবস্থা শুনিয়া মানিক সদাগর হুকুম দিলেন, আমার চোদ্দ কাহন, (১১২০খানি) যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত কর। ছার কাটিনী নগর সমুদ্রের তলে ডুবাইয়া তবে তোমরা দেশে ফিরিবে। তৎপূর্ব্বে নহে। গরলধর মাঝি ডিঙ্গিগুলি সাজাইয়া আনিল। 'ফোরকান' নামক জাহাজখানিতে কোরাণ সরিপ ও ধর্ম্ম পুস্তক বোঝাই হইল। সেই ডিঙ্গা সর্ব্বাগ্রে চলিল। দ্বিতীয় জাহাজ 'কালাধর' তাহাতে আমির সদাগর স্বয়ং আরোহী হইলেন। তৃতীয় ডিঙ্গার নাম 'কল্যাণ'— তাহাতে সারি সারি বন্দুক ও কামান সজ্জিত হইল। তারপর 'কাঞ্চন মালায়' বারুদ ও গোলা ভর্ত্তি হইল। পঞ্চম ডিঙ্গা লস্করে পূর্ণ হইল, এই ডিঙ্গার নাম গুয়াধর। বাংলাদেশের বিখ্যাত লাঠিয়ালগণ 'হংসমালা' জাহাজে উঠিয়া বসিল। 'শ্যামল সুন্দর' ডিঙ্গায় পশ্চিমা সেপাইগণ আস্তানা করিল। ঢাকঢোল এবং অন্যান্য যুদ্ধের বাজনা লইয়া বাদ্যকরেরা 'হাঙ্গর' নামক ডিঙ্গার আরোহী

হইল। "খেয়াপাটি' ডিঙ্গায় তৈল মাখানো বাঁশের লাঠি ও নানা রকমের হাতিয়ারে ভর্ত্তি করা হইল, রং মাখাইয়া ঢাল ও কীরিচ বোঝাই হইল এবং 'ইক্চুর' ডিঙ্গায় ছয়মাসের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত রহিল, "আউল বাউল" ডিঙ্গায় সরু চাল বোঝাই হইল। তারপর 'হুরসুর' নামক জাহাজখানি মিঠা জলে পূর্ণ হইয়া লবণাম্বুর পথে রওনা হইল। 'লক্ষীধর' নামক শেষ ডিঙ্গাখানিতে স্বয়ং কর্ণধার এবং জলযুদ্ধের নেতা গরলধর মাঝি রওনা হইল।

"হু হু করি ছুটিলরে চৌদ্দ কাহন ডিঙ্গা।
ঢাক-ঢোল বাজে আর মাঝি ফুকে শিঙ্গা॥"

তাহাদের এই বিশাল অভিযানের পথে হাঙ্গর-কুমীর প্রভৃতি জলজন্তু পলাইয়া গেল।

"হু হু করি ছুটিল বাতাস—পালে দিল ডাক।
তিন দিন আইল তারা কাঁটানীর বাঁক॥
ঘাটেতে আসিল সাধু দাগিল কামান।
ঘোর শব্দে বজ্র যেন ভাঙ্গিল আশমান॥"

পশ্চিমা সেপাইগুলির বড় বড় গোঁপ; তাহারা বন্দুক কাঁধে করিয়া কাটনী নগরে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের সকলেরই কোমরে কীরিচ বাঁধা। লাঠিয়ালগণ লম্বা লম্বা বাঁশ হাতে লইয়া কাটানী নগরে মারধর আরম্ভ করিল। তাহাদের ডাকে-হাঁকে ও কামানের শব্দে পুরীখানি কাঁপিয়া উঠিল।

রণডঙ্কার শব্দে ও সৈনিকদের কোলাহলে মুনাপ কাজির

৬

চৈতন্য হইল। কাজি বুঝিতে পারিল যে সে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। একে ত তাহার সৈন্যসংখ্যা অল্প, তাহার উপর ভোলা সদাগরের প্রতিকূলে বিচার করিয়া সে তাহাকে শত্রু করিয়া তুলিয়াছে,—সদাগরের অনেক সৈন্য। সে হয়ত শাক্‌লা বন্দরের লোকদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। এদিকে ভেলুয়া শঙ্কটাপন্ন পীড়ার অবস্থায় তাহার বাড়ীতে আছে। সুতরাং শত্রুপক্ষ ভেলুয়ার জীবন-সঙ্কট পীড়ার অবস্থা—তাহারই অত্যাচারের ফল মনে করিয়া সমস্ত দায়িত্ব তাহার ঘাড়ে চাপাইবে। ভেলুয়া নিজেও হয়ত সে সমস্ত অভিযোগ সমর্থন করিবে।

এই আশঙ্কায় ও দ্বিধায় বিচলিত হইয়া সে কাল-বিলম্ব না করিয়া ভোলার গৃহে যাইয়া তাহাকে বলিল,—"ভেলুয়া দারুণ রোগের জ্বালায় ভোলা সদাগরের নাম ধরিয়া 'ওগো কোথায় গেলে আমায় রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিতেছে। আমার মত জীর্ণ শতবৎসরের বুড়াকে সে অবশ্য পছন্দ করিতে পারে না। ইহার জন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। ইহা স্বাভাবিক, এখন কি করিব? তাহাকে কি তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব?"

ভোলা ভেলুয়ার রূপে মুগ্ধ, ভেলুয়ার ভালবাসা পাইবার জন্য সে এই বিপদের মুহূর্ত্তেও লালায়িত। ভেলুয়া নিদারুণ রোগের যন্ত্রণায় তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছে, কাজির এই মিথ্যা সংবাদটা সে বিশ্বাস করিল। মানুষের মন যাহা চায়, সেইদিকে সে বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বাঞ্ছিত কথা শুনিতে ও বিশ্বাস করিতে প্রাণ

চায়; প্রেমের এই ভরসা-পাওয়া তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল, এবং ভেলুয়াকে আনিবার জন্য সে অতি সতর্কভাবে ব্যবস্থা করিতে লাগিল। এই সুযোগে কাজি সদাগরের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া আসন্ন যুদ্ধে তাহার সহায়তা চাহিল। কিছুকাল ভাবিয়া ভোলা এই সাহায্য করিতে সম্মত হইল। যে ভেলুয়ার তাঁহার প্রতি অনুরাগের অমৃতময় সংবাদটি দিয়াছে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল; কাজি ও ভোলা সদাগরের সমবেত সৈন্য আমিরের সৈন্যের অগ্রগতিতে বাধা দিল।

কিন্তু ভেলুয়ার প্রতি অত্যাচারের দরুণ আমিরের মন ভয়ানক উত্তেজিত ছিল—তাহার সৈন্যেরাও রাজবধূর এই অপমানে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিল—শাফলা বন্দরের সৈন্যসংখ্যা ও আয়োজনপত্র বিরাট ছিল। তাহারা উন্মত্ত হইয়া কাটানী নগর নষ্ট করিবার জন্য বন্যার মত কাজির বাড়ী ও সদাগরের প্রাসাদের উপর আসিয়া পড়িল। চারদিন বারুদের ধেঁায়ায় আঁধার,—নগরবাসীরা ঘোর বিপদে পড়িয়া অসহায় ভাবে প্রাণ দিতে লাগিল,—শত শত লোক মরিতে লাগিল। সমস্ত নগরটি একটি বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইল। যুদ্ধের বর্ব্বর অপদেবতার তাণ্ডবে পুরীখানি ধ্বংস পাইতে বসিল। অবশেষে কাটানী-লোকের রক্তে সমুদ্রের জল লাল হইয়া উঠিল এবং তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল।

ভেলুয়া সেই আদালত-গৃহে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহার শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হইল। তিনি ব্যাকুলভাবে চক্ষু মেলিয়া আমিরকে খুঁজিবার জন্য চারিদিকে নিঃসহায় ভাবে চাহিতে

লাগিলেন, ভাঙ্গা পুতুলটি কোলে লইয়া শিশু যেরূপ কাঁদিয়া আকুল হয়,—সেই স্বর্ণপ্রতিমাকে সম্মুখে রাখিয়া আমির আর্ত্তভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ভোলা সদাগরের বাড়ী বিজয়ী সৈন্যেরা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহাকে সেইখানে হত্যা করিয়া তাঁহার দেহ শত খণ্ডে ভাগ করিয়া সমুদ্রের ঢেউয়ে নিক্ষেপ করা হইল। তাহার প্রকাণ্ড প্রাসাদ যে ভূমির উপর দাঁড়াইয়া ছিল, পাপিষ্ঠের সেই বাসভূমিতে একটা দীঘি কাটা হইল, তাহার নাম হইল 'ভেলুয়ার দীঘি'—ভেলুয়ার প্রতি অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ—এই দীঘিটি এখনও বিদ্যমান। মুনাপ কাজির বাড়ী ও কাচারী যেখানে ছিল সেই ভিটাটি এখনও লোকে দেখাইয়া থাকে।

এদিকে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া গরলধর চৌদ্দ কাহন ডিঙ্গি লইয়া শাফলা বন্দরের দিকে অগ্রসর হইল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের মত মুমূর্ষ ভেলুয়ার পার্শ্বে একটি স্তব্ধ প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায়—আমির রাত্রি দিন না খাইয়া না ঘুম যাইয়া একভাবে বসিয়াছিল—রূপসী ভেলুয়ার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার অশ্রু তদবধি শুকায় নাই।

ভেলুয়ার শতদলের ন্যায় সুন্দর মুখখানির উপর আমিরের দৃষ্টি ন্যস্ত। শত শত লোক বিজয়ী বীর ও বীর পত্নী দেখিতে বন্দরে ভিড় করিয়াছে, তাঁহারা অতি আনন্দে—অতি আশায় আসিয়াছিল, কিন্তু চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গেল।

হাতে ধরি ভেলুয়ারে কাঁদিছে আমির।
মুখে নাই কথা কন্যার, দুটি চক্ষুস্থির।

ভেলুয়া

বিজয়ের আনন্দে বন্দরটি শত শত দীপ মালায় আলোকিত করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা মনের আঁধার ঘুচাইতে পারে নাই। সমস্ত নগরটি বিষাদের আঁধারে ডুবিয়া রহিল!

সমুদ্রতীরে ভেলুয়ার কবর দেওয়া হইল। সদাগর উন্মত্ত হইয়া অষ্টপ্রহর সেই সমাধির চারিদিকে ঘুরিত :—

পেটে ক্ষুধা নাই, তার মুখে নাই বাণী।
কলিজাতে লৌ নাই, চোখে নাই পানি।

পাগল আমির একদিন শেষ রাত্রে দেখিতে পাইল, সাতটি স্বর্গের পরী আসিয়া ভেলুয়াকে ডাকিতেছে :—

"উঠিল উঠিল কন্যা ছাড়িয়া কবর।
পরীদের সঙ্গে চলি গেল আসমানের উপর।"

আমিনা

(১)

আমিনা চট্টগ্রামের এক প্রসিদ্ধ বন্দরের নাবিক হায়দারের কন্যা। সে পরমা রূপবতী ছিল ; নছর নামক হায়দারের শ্যালির পুত্র পিতামাতা ও ঘরবাড়ী হারা হইয়া হায়দারের বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছিল। আমিনা ও নছর একত্র থাকিত, একত্র খেলা করিত,—কোন সময় নীল সমুদ্রের গর্জ্জন শুনিয়া স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া থাকিত, অন্য সময় গিরিশৃঙ্গমূলে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিয়া বাড়াইত ; আমিনা যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী ছিল, নছরও সেইরূপ রূপবান্ ও প্রতিভাশীল ছিল।

হায়দার দেখিল, উভয়ে উভয়ের অনুরাগী এবং যোগ্য ; সুতরাং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আমিনার সঙ্গে নছরের বিবাহ দিল।

কিন্তু সত্য বলিতে গেলে, আমিনা নছরকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিত। কিন্তু শৈশব হইতে একত্র ভাই বোনের মত ঘনিষ্ঠ ভাবে থাকার দরুণ, নছর আমিনাকে স্ত্রী বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে যে আনন্দ চাহিয়াছিল, আমিনা সে কল্পলোকের সঙ্গী হইতে পারিবে না, এই আশঙ্কা করিয়া নছর শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া গোপনে চলিয়া গেল ; সে কোথায় গেল, তাহা কেহ জানিত না। কবে আসিবে, ইহার কোন কথা স্ত্রীকে বা শ্বশুর বাড়ীর কোন লোককে কহিয়া যায় নাই।

ক্রমে দুই বৎসর চলিয়া গেল, নছরের কোন সংবাদ নাই। আমিনা দুঃসহ শোকে পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়ের নিম্নভূমিতে বেড়ায় এবং দূর-প্রসারিত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকে। পাল উড়াইয়া শত শত ডিঙ্গা সমুদ্রের ফেনা কাটিয়া চলিয়া যায়, আমিনা ভাবে, ইহার কোনটিতে হয়ত নছর ফিরিয়া আসিবে,—বৃথা আশা। আমিনার দুটি চক্ষু জলে ভাসিয়া যায়। বাড়ীর পাছে ঝিঙা ক্ষেত,—তাহার ডালে ডালে টুনি পাখী লাফাইয়া বেড়ায়। তারা দিনের বেলা খাদ্য খুঁজিয়া উদর পূর্ত্তি করিয়া লালবর্ণ লঙ্কা ঠোঁটে করিয়া রাত্রিকালে কত আশায় নীড়ে ফিরিয়া আসে এবং তাহার সাথীর সঙ্গে মিলিত হয়! হায়! আমিনার ভাগ্যে সেরূপ মিলন-রাত্রি আর আসিবে না, আমিনার দুটি চক্ষু জলে ভাসিয়া যায়। সে কৃশ হইয়া পড়িয়াছে—তাহার শীর্ণ হস্ত হইতে সোনার কঙ্কন খসিয়া পড়ে। "হে স্বামি,—তোমার প্রেম চিরদিন থাকিবে না, কাটারিতে যদি ধার না দেওয়া যায়—তাহা যদি ব্যবহারে না আসে—তবে তাহা মরিচা ধরিয়া যায়—দীর্ঘ দিন পরে কি আমার প্রতি তোমার অনুরাগ আর থাকিবে? তখন আমি কি করিব?"

"আমার পিতা-মাতা আমাকে তোমার চিন্তা ছাড়িয়া দিতে বলেন। আমি দ্বিতীয় বার বিবাহ করিব না; যদি জীবন যায়, তবে মরণ কাল পর্য্যন্ত আমি তোমারই দাসী থাকিব এবং যদি তোমাকে ছাড়িয়া না থাকিতে পারিয়া আমার মৃত্যু হয়, তবে তুমিই আমার বধের ভাগী হইবে।"

(২)

ছয় বছর চলিয়া গেল। পাড়ায় ধনী যুবক এসাকের বাড়ী। ধনবান ও প্রভাবশীল কোন ব্যক্তির মেমাজান নামক কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়, কিন্তু মেমাজানের মেজাজ বড় রুক্ষ ও গর্ব্বিত; স্বামীকে সে বশীভূত করিবার উপায় পায় নাই। স্বামী-পরিত্যক্তা আমিনার উপর তাহার দৃষ্টি,—সে আনাচে কানাচে, সমুদ্রের উপকূলে, পুষ্পিত লতা মণ্ডপে,—এবং অন্যান্য যে সকল স্থানে আমিনা যায় বা বিশ্রাম করে, সেইখানেই তাহাকে অনুসরণ করে এবং তাহার মন বুঝিবার জন্য নানারূপ ইঙ্গিত করে। কিন্তু আমিনা সে সকল গ্রাহ্য করে না এবং এমন ভাবে ভ্রূভঙ্গী করে যে—এসাক তাহার কাছে বিবাহের কোন প্রস্তাব করিতে সাহস পায় না।

আমিনার পিতা হায়দার অতি দরিদ্র, সে বৃদ্ধ এবং দুইবেলা আহারের সংস্থান করিয়া উঠিতে পারে না। তাঁহার স্ত্রীও বৃদ্ধা এবং সংসারের কাজকর্ম্মে অশক্তা। নছর কবে আসিবে, বহুকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া তাহারা একরূপ নিরাশ হইয়াছে।

এসাক একদিন আসিয়া হায়দারকে বলিল, "প্রায় সাত বৎসর গত হইয়াছে, নছর বিদেশে গিয়াছে। শাস্ত্রমতে আমিনার এখন নূতন স্বামী লইয়া ঘর করিতে কোন বাধা নাই। ইহাদের দাম্পত্য-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমি ইহাকে

বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। আমিনার দুঃখে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। আপনারা যদি আমাকে সম্মতি দেন, তবে আপনার সংসার প্রতিপালনের জন্য কোন কষ্টই পাইতে হইবে না। আপনাকে আমি সমুদ্রের ধারে আট বিঘা ফলন্ত জমি দিব, আমিনাকে হাত, কান ও চুল সাজাইবার জন্য তাল তাল সোনা দিব। সেগুলি দিয়া সুন্দর কঙ্কণ হার ও সিঁথি-পাটি গড়িয়ে দিব। তোমার বুড়া বয়েসে আর দুঃখ-মেহান্নত করিয়া সংসার চালাইতে হইবে না। বাবা! তুমি সম্মতি দাও, আমি আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া জীবনে সুখের মাত্রা পূর্ণ করি।"

হায়দার বলিল, "শুনিয়াছি তোমার স্ত্রী এক ধনীর কন্যা। সে নাকি বড়ই গর্ব্বিতা, আমিনা কি তোমার বাড়ীতে যাইয়া তাহার বাঁদী হইবে?"

দাঁতে জিব কাটিয়া এসাক বহু কথা কহিল এবং বা... "মেমাজান বিবি তাহার গর্ব্বিত ব্যবহারের জন্য আমার ঘরে বাঁদীর হালে আছে? আর আমিনাকে আমি এত মূল্যবান গৃহ, আস্‌বাব্ ও অলঙ্কার দিব, যে আমি যদি সৌজন্য ও প্রীতি দিয়া তাহার অনুরাগ আকর্ষণ করিতে নাও পারি, তবে তাহার স্বাধীনভাবে থাকিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে কোনই বে... পাইতে হইবে না।"

হায়দার বলিল, "আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি, আমিনা সম্মত হয় কিনা বুঝিয়া লই।"

সেইদিন আমিনার মাতা তাহাদের সংসারের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা আমিনাকে নূতন করিয়া জানাইল এবং আমিনা এসাককে বিবাহ করিলে যে সব দিক তাহাদের শুভ হইবে, তাহার ইঙ্গিত দিয়া আমিনার এই প্রস্তাবে রাজি হওয়ার জন্য অনুরোধ করিল।

আমিনা মায়ের কথা শুনিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল, যতক্ষণ তিনি তথায় ছিলেন, আমিনা তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল না ও কথা বলিল না। সে তিন দিন অনাহারে এক ভাবে বসিয়া রহিল।

(৩)

সেই মাঝের গ্রামে বুধা নামক এক গুণী ব্যক্তি ছিল, তাহার মন্ত্র পড়া তাবিজ ধারণ করিলে সব অভীষ্টই পূর্ণ হইত। দশ বিশ ক্রোশের মধ্যে যত পল্লী আছে, বিপদে পড়িলে তথাকার লোকেরা বুধার নিকট ছুটিয়া আসিয়া তাহার শরণ লইত। বন্ধ্যা আসিত, একটি পুত্র পাইবার কামনা করিয়া মন্ত্রপড়া জল ও গাছের শিকড় লইয়া যাইত। স্ত্রীলোকের আঁচলের কোণ এবং আঙ্গুলের নখ দিয়া সে যাদু দ্রব্য প্রস্তুত করিত, তাহা কবচে পুরিয়া ধারণ করিলে অসাধ্য সাধন হইত। কাহাকে সরিষার তৈল পড়া, কাহাকে সে পান পড়া দিত, লোকের বিশ্বাস—তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। কেহ তাহাকে আনাজি কলা, কেহ মানকচু বেগুন, উপহার দিয়া তাহার আঙ্গিনা ভর্ত্তি করিত। দিনের বেলা সে ভাঁড়ে ভাঁড়ে মহিষের দই

এবং রাতে প্রচুর পরিমাণে দুধের ছানা উপহার পাইত। তাহার ব্যবসায় খুব অর্থকরী হইয়া উঠিয়াছিল; লোহার সিন্দুক টাকা ও মোহরে ভর্ত্তি হইয়াছিল।

এই বুধা-গুণীর বাড়ীতে এসাক আসিয়া উপস্থিত হইল। বুধা তাহার মুখ দেখিয়া বলিল, "কোন স্ত্রীলোকের হৃদয় অধিকার করিতে চাহিতেছ এজন্য আমার কাছে আসিয়াছ, আমি এমন যাদু করিব, তাহাতে সে রমণী নিজে তোমার কাছে আসিয়া ধরা দিবে, কোন চিন্তা করিও না।" বিমর্ষ ভাবে এসাক তাহার দুঃখের কথা বলিল—"আমার পেটে ভাত নাই, এই কয়দিন আমি উপবাসী আছি, রাতে বিছানায় পড়িয়া ধড়ফড় করি, একবিন্দু ঘুম আমার চোখে আইসে না। তুমি আমিনাকে আমার প্রতি অনুকূল করিয়া দাও, আমি বহু উপঢৌকনের সঙ্গে তোমাকে আট দ্রোণ ভূমি দান করিব।"

বুধা বলিল "কাল অতিপ্রত্যূষে তুমি নজু তেলীর ঘরে যাইয়া আমার নাম করিয়া তাহার ঘানি হইতে প্রথম আট ফোঁটা তৈল চাহিয়া আনিবে। আমি শনিবারে সেই তৈল মন্ত্র পড়িয়া দিব—দেখিও তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে।"

এই তৈল লইয়া এসাক গেলে, হায়দার তাহার স্ত্রীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ষড়যন্ত্র করিল। পরদিন প্রাতে মাতা-পিতা দুইজনে আমিনাকে বলিল, "আজ আমরা বহুদিনের অন্তরঙ্গ এক আত্মীয়ের বাড়ী যাইব, সন্ধ্যা না হইতে হইতেই আমরা বাড়ী ফিরিব, তুমি বাড়ী আগলাইয়া থাকিও।"

আমিনা

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এসাক রেশমী লুঙ্গী পরিয়া বুধার পড়া-তৈল নিজ মুখে মাখিয়া হায়দারের বাড়ীর অভিমুখে রওনা হইল। বাড়ীর কাছে আসিতে আসিতে সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ডুবিয়া গেল এবং দ্বিতীয়ার চাঁদের মৃদু কিরণ তাহার বাড়ীর গাছগুলির উপর ঝিকিমিকি করিতে লাগিল। বড় আশায় এসাক হায়দারের বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, দরজা বাহির হইতে বন্ধ। ডাকিয়া সে আমিনার কোন সাড়া পাইল না।

পিতামাতা এসাকের সঙ্গে যুক্তি করিয়া মেয়ের সঙ্গে তাহার মিলনের যে সুযোগ দিয়াছিলেন, আমিনা সে সুযোগের পূর্ব্বাভাষ টের পাইয়া আগেই পলাইয়া গিয়াছে। সুতরাং বন্য হস্তী খেদায় পড়িল না, বৃথাই খেদা প্রস্তুত হইল,—ফাঁদ পাতা হইয়াছিল কিন্তু খাদ্যের লোভে ডাহুক পাখী গলা বাড়াইয়া সে ফাঁদে পড়িল না,—পাহাড়িয়া বানর কলা খাইবার লোভে ফাঁদের দিকে আসিল না। সারারাত্রি বুধার দেওয়া তেল মুখে মাখিয়া এসাক সেই বাড়ীর দুয়ারে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। সর্ব্বাঙ্গে মশার কামড়ে জ্বালা-পোড়া হইল। খাঁচার শিক কাটা তোতাপাখী কোন্ পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কে জানে! এসাক বুধার তেল-মাখা মুখখানি আমিনাকে দেখাইয়া তাঁহাকে বশীভূত করিবার সুযোগ পাইল না। সে বুধাকে গালি দিয়া বাড়ী ফিরিয়া মুখের তৈল মুছিয়া আতর ঘষিতে লাগিল।

এদিকে বাড়ী ছাড়িয়া নছর এক জাহাজে কাজ লইয়াছিল। জাহাজখানি বড়, তাহার মালিক ছিলেন সেকেন্দার বাদশা। বিস্তৃত ভাবে বাণিজ্য ও যুদ্ধাদির প্রয়োজনে তিনি [illegible] দ্বারা সমুদ্রের জরিপ করাইতে ছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই নছর [illegible] কার্য্যে বিশেষরূপ দক্ষতা দেখাইল। তাহার পোষা হীরামণ [illegible] জলের উপর উড়িয়া উড়িয়া কোথায় গভীর জল, কোথায় বা জলের নীচে চরাভূমি, তাহা নানারূপ ইঙ্গিতে বুঝাইত। নছর নক্ষত্র দেখিয়া জাহাজের দিক্ নির্ণয় করিতে পারিত এবং হাওয়ার গতিদ্বারা কখন ঝড় আসন্ন তাহা বুঝিত। সে সমুদ্রের যে মানচিত্র (chart) প্রস্তুত করিল, তাহা সেকেন্দর বাদসা অনুমোদন করিলেন এবং অনেক সমুদ্রগামী স্লুপ ও ছোট ছোট জাহাজ সেই চিত্রের সাহায্যে বিশেষ উপকৃত হইল। নছর লস্কর হইয়া কাজে প্রবর্ত্ত হইয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই মালুমের পদে উন্নীত হইল। পূব দিকে সমুদ্রের তীরে অঙ্গী নামে এক বন্দর ছিল, সেইখানে নছর মালুম বিস্তৃত কারবার খুলিয়া ধনশালী হইল।

অঙ্গী-বন্দর বড় বিচিত্র স্থান; সেখানে মেয়েদের লাজ-সম্ভ্রম নাই। তাহারা ভিড় ঠেলিয়া রাস্তায় চলে, মেয়েরাই হাটবাজার করে ও পুরুষেরা ঘরে বসিয়া রান্নাবান্না করে। তাজা মাছ ছাড়িয়া তারা শুট্‌কি মাছ খায় এবং সেই মাছকে 'নাপ্পি' বলে। মেয়েরা [illegible] সোনার একরূপ কানের গহনা পরে—তাহার নাম নাধং। মূল্যবান আড়াই গজ পরিমিত রেশমী লুঙ্গী তাহারা এক পেচে পরে এবং যখন

নাধং দোলাইয়া তাহারা হাটে বাজারে যায় তখন পুরুষদের সঙ্গে হাসিয়া ও তামাসা করিয়া মেলামিশা করে।

এই অঙ্গী সহরে মাফো নামক এক ধনী বণিক ছিল। তাহার ষোড়ষ বর্ষীয়া একিন নাম্নী এক কুমারী কন্যা ছিল। নছর তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং মাফো তাহাকে যোগ্য পাত্র মনে করিয়া একিনের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিল।

এই বিদেশিনী রূপসীকে বিবাহ করিয়া নছর আমিনার কথা একবারে ভুলিয়া গেল। আমিনার স্নিগ্ধ লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি, তাহার মুখের সুন্দর হাসি,—অল্প বয়সে তাহার সঙ্গে যে সকল খেলা সে খেলিয়াছে এবং তাহার যত ভালবাসা সে পাইয়াছে—তাহার সমস্তই সে ভুলিয়া গেল।

কিন্তু অঙ্গী দেশের মেয়েরা যেরূপ বাহ্যিক রূপ ও হাসি দিয়া মন ভুলায়—তাহারা প্রকৃত স্নেহ ও প্রেমের মর্ম্ম সেরূপ বোঝেনা। এই আখ্যায়িকা-রচক পল্লীর মুসলমান কবি লিখিয়াছেন :—

পাহাড়ের নিম্নভূমির গরু, নদীর পারে ঘর, মুসলমানের বিবি এবং হিন্দুর মুখের দাড়ি—ইহাদিগকে প্রত্যয় করিও না।

মুড়্যার কুলে গরু আর গাঙ্গের কুল্যে বাড়ী
মুসলমানের বিবি আর হিন্দুর গালের দাড়ি
এ সকলের কোন দিন থাকেনা ঠিকানা।
প্রত্যয় না ক'র কেহ, করি আমি মানা।"

একিন যে ভালবাসা দেখাইয়া নছরকে বশীভূত করিয়াছিল তাহা খুব গভীর নহে।

৭

. ৪

দক্ষিণ সাগরে পরীদিয়া নামক একটী নূতন দ্বীপ অল্পকালের মধ্যে একটা বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিল। কথিত আছে, পূর্ব্বকালে এই স্থানে পরীরা বাস করিত। এজন্য ইহার নাম পরীদিয়া (পরীদ্বীপ)। ক্রমে এস্থানে নানা দেশের কারবারী লোক আসিয়া বসবাস করিতে লাগিল ; জেলেরা সমুদ্রের কূলে বাস করিয়া অগুন্তি মাছ ধরিত এবং সেই মাছ শুকাইয়া লইয়া দেশ-বিদেশে শুট্‌কী মাছের চালান দিত। পরীদিয়া শুকনা মাছের একটা আড়ৎ হইয়া উঠিল! এই চরের 'লাউখা' মাছের নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল এবং এখানে মাছের ব্যবসা করিয়া অনেকেই খুব ধনী হইয়া উঠিল।

অঙ্গীতে মাফো সদাগর এই ক্রম-বর্দ্ধিষ্ণু কারবারের কথা শুনিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। নছরের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া এই কারবার চালাইতে সে প্রস্তুত হইল। সেথানে যাইতে ১২ দিন লাগে। নছর বলিল, যাইতে আসিতে ২৪ দিন যাইবে ; এক মাসের মধ্যে চালান লইয়া সে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।

একিনের কাছে বিদায় লইতে গেল—এবং বলিল "তুমি চিন্তা কোরনা, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।" একিন মুচকি হাসিয়া বলিল—"দেখ যেন কোন স্থানে আর একটা বিয়ে করিয়া আবদ্ধ [illegible] হইয়া পড়।"

আমিনা

একিনের কাছে গিয়া কহিল নছর।
মাসেকের লাগি যাব পন্নীদিয়ার চর।
মনে দুঃখ না করিও আসিব ফিরিয়া
হাসিয়া কহিল একিন না করিও বিয়া।

মাঘ মাসের শেষ দিকে খুব জোর হাওয়া দিতে লাগিল। নছর অঙ্গী সহর হইতে উত্তর দিকে রওনা হইল। সে একটা বাইশ পালের সুপে চড়িয়া যাইতেছিল, প্রবল বাতাস পাইয়া তাহার জাহাজ গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিল, জোয়ান জোয়ান লস্কর সারি গান গাইয়া দ্রুতবেগে উহা বাহিতে লাগিল। উত্তর দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইয়া আরোহীরা তথায় প্রকৃতির এক বিচিত্ররূপ দেখিতে পাইল; নীল আকাশ ছাইয়া কত রঙ্গের পাখী উড়িতে ছিল, মাঝে মাঝে সমুদ্রের চরায় কত রং বেরঙ্গের ফুল ফুটিয়া আছে। অসীম সমুদ্রের মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ। দ্বীপগুলি শত শত নারিকেল গাছে ভর্ত্তি, তাহারা যেন চিত্রাঙ্কিত। সহস্র সহস্র নারিকেল সমুদ্রের ঢেউএর উপর পড়িতেছে—তাহা মানুষের ব্যবহারে লাগেনা, ফেনের ন্যায় তরঙ্গের উপর ভাসিয়া চলিয়াছে। কোন কোন চরা-জায়গায়—বৃক্ষ নাই—বালুর ঘূর্ণাবর্ত্ত বহিয়া যাইতেছে, শত শত কুমীর সেই বালুর চরে বাসা করিয়া আছে, তাহাদের প্রকাণ্ড ডিমগুলিতে বালুর চাপা দিয়া কুমীরেরা তাদের উপর বসিয়া

তা' দিতেছে। ইহার পর কতকগুলি চরাতে বড় বড় অজগর লাফাইয়া ছুটিতেছে, তাঁহারা অসংখ্য। সমুদ্রের উপকূলে নিবিড় জঙ্গলে বাঘ ভালুক প্রভৃতি জানোয়ার এক চরা হইতে নিকটবর্ত্তী চরায় সাঁতরিয়া যাইতেছে। এইরূপ বিচিত্র জীবজন্তু ও বিরাট প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে নছর মালুম হাওয়ার জোরে বার দিনের পথ ছয় দিনে অতিক্রম করিয়া পরীদিয়াতে আসিয়া পৌছিল। সেখানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে 'লাউথা' মাছ কিনিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া—নছর আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া ভাবিল, বিপরীত দিকের ঝড়ে জাহাজ চালান বড়ই দুষ্কর হইবে, ঝড়ের বেগ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। মাঝি—লস্করদিগকে জাহাজ আরও উত্তর দিকে চালাইতে আদেশ করিয়া সে মাঝদিয়া গ্রামের পাশে আসিয়া লঙ্গর করিল।

দিক্‌বিদিকে দৃষ্টি নাই। জ্ঞানহারা হইয়া সে বাড়ীর অভিমুখে ছুটিল, পথিমধ্যে শুনিতে পাইল, তাহার শ্বশুর হায়দার মারা গিয়াছে এবং তাহার শাশুড়ী নানারূপ অবস্থান্তরে পড়িয়া অনাহারে অনিদ্রায় কঙ্কাল-সার হইয়াছে। সে অতি বৃদ্ধা ও নানা রোগে শোকে কুব্জ হইয়া লাঠি ধরিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া খায়। বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার গাছতলাই শয্যা। সে কোন দিন কোথায় থাকে তাহার ঠিকানা নাই, তাহাকে নছর খুঁজিয়া পাইল না। খুঁজিয়া পাইল এত দরদের ভিটাটি, সে ভিটার পশ্চিম কোণে এখনও তিন্তীরি বৃক্ষটি আছে, সে ভিটায় তাহার শয়ন গৃহের স্নেহসারসিক্ত ভিতের উপর আমিনার হাতের চরকাটি পড়িয়া আছে। রান্না-

আমিনা

ঘরের উত্তর দিকে বারমাসিয়া বেগুনের চারায় রক্তিম ও সবুজ ফুল ফুটিয়া আছে। আমিনা কোথায় গিয়াছে! সেই ভিটার উপর সারাটা দুপুর নছর বসিয়া রহিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহার শিশু-কালের কথা মনে পড়িতে লাগিল, আজ আমিনার জন্য ঝর ঝর করিয়া তাহার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। "আমি তাহাদিগকে এই দীর্ঘকাল কোন সংবাদই দেই নাই, তাহারা যেন আমার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছে," আজ অনুতাপে ও স্নেহ-শোকে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সারাদিন সে সেই ভিটার উপর বসিয়া রহিল, সূর্য্যের কিরণে তাহার মস্তক দগ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহার হুস নাই। সন্ধ্যাকালে সে উঠিয়া বাজারে এক দোকানে অতিথি হইল। নানাজনে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল, একজন বুড় হায়দারের মৃত্যুবর্ণনা করিয়া আপশোষ করিতে লাগিল। বুড়া কি কষ্ট পাইয়াই না মরিয়াছে। মেয়েটা ছিল খারাপ—সে বাপ-মাকে না কহিয়া না বলিয়া যৌবনে পলাইয়া গেল, নিশ্চয়ই কোন কুলোক তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে, সেই শোকে ও লজ্জায় হায়দার মারা গিয়াছে। আমিনার পলায়নের পর বুড়িটা মাটীতে পড়িয়া ধড়ফড় করিতে লাগিল, তাহার কথা মনে পড়িলে এখনও কান্না পায়।

এই সকল আলোচনা শুনিয়া নছরমালুম প্রস্তুত আহার্য্য খাইলনা—সারারাত্রি একটুও ঘুমাইল না।

"শুনিয়া এ সব কথা নছর মালুম।
দানাপানি না খাইলরে না গেলরে ঘুম।"

৬

আমিনা পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে স্বগৃহের দোরগোড়ায় তাঁহার এত সাধের সোনার দুল জোড়া, রঙ্গিন সবুজ সাটিনের কুর্ত্তা ও নাকের নথ ফেলিয়া গিয়াছে; সে শুষ্কমুখে অনাহারে মনের দুঃখে বাড়ী ছাড়িয়া নদীর কূলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতামাতার উপর তাহার অভিমান হইয়াছে। তাহারা বুঝিলেন না, "আমার স্বামী প্রাণমন দখল করিয়া আছেন, দুষ্ট এসাকের জন্য আমার কপালে এত দুঃখ ছিল। কপালের দোষে স্বামী থাকিতে আমি অনাথা। বাবা মা বুঝিলেন না, বাড়ী ঘর দিয়া আমি কি করিব— শঙ্খনদীর পারে আট বিঘা জমি দিয়াই বা আমি কি করিব? সোনার হার বুকে দোলাইবার আমার সাধ নাই, সে বুকে স্বামীর জন্য যে ক্ষত হইয়াছে, তাহার জ্বালায় দিনরাত আমি ছটফট করিতেছি, আমি দ্রোণ-পরিমিত ভূমির কাঙ্গাল নই, গরু মহিষ হাল এ সকল দিয়া কি বুকের জ্বালা জুড়ান যায়? পিতামাতা আমার দুঃখ বুঝিলেন না, বরং ঢেকিশালে ধান ভানিয়া খাইলে আমার দিন গুজরাণ হইবে।"

গৃহের প্রতি অভিমান হইলেও সেই নিরাশ্রয়া রমণী গৃহের কথা ভুলিতে পারিল না, কোনদিন নদীর তীরে বসিয়া বাড়ীর আমগাছগুলির কথা স্মরণ করিয়া চোখের জল ফেলিল, গাছগুলিতে গুচ্ছ গুচ্ছ আম ফলিয়াছে, কাঁটাল গাছ মুচিতে ভর্ত্তি হইয়াছে, বাড়ীর

লাউ কুমরো গাছ হইতে পাড়িয়া মাচার উপর রাখিয়া আসিয়াছে, সেগুলি হয়ত বা পচিয়া গেল। বাপের বাড়ীর ঢাকনিতে ঢাকা জলের কলসীগুলি মনে করিয়া সে কাঁদিতে লাগিল—সেই কলসী-গুলির প্রতিও তাহার মনে কত দরদ। কাঁদিয়া সে নিজে নিজে বলিতে লাগিল "আমার পরাণ খোঁজেরে সেই কলসীর পানি" অগাধ নির্ম্মল জলপূর্ণ নদীর তীরে বসিয়া সে বাড়ীর মেটে কলসীর জল যে কত মিষ্ট তাহা বুঝিতেছে। হায়রে বাড়ীর উপর বাঙ্গালী মেয়ে-পুরুষের যে অন্তরের কত টান্, তাহা সেই সময়ের নরনারীরা বুঝিতেন। আমিনা বাড়ীর আঙ্গিনার করুই গাছটাকে মনে করিয়া আবার খানিকক্ষণ কাঁদিল, সেই পাতা গুলির উপর বাতাস বহিলে ঝুম ঝুম শব্দ করিয়া বাজিত, সেই শব্দ এখন তাহার কানে যে কত মিঠা লাগিল, তাহা সে কি করিয়া বুঝাইবে?

অভিমানে বাড়ী ছাড়িয়া অথচ বাড়ীর প্রতি পরিপূর্ণ দরদ লইয়া মহা দুঃখে আমিনা বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—তাহার রূপই তাহার শত্রু! হে আল্লা! তুমি কেন আমাকে রূপ দিয়াছিলে, সে কত প্রলোভন কত ভীতিপ্রদর্শন আল্লার দোয়ায় এড়াইয়া আসিল, দূর হইতে দূরে যাইতে লাগিল, কত গ্রাম, কত নদী নালা, খাল-বিল সে অতিক্রম করিল, কত প্রতারক যুবকেরা তাঁহার পিছনে পিছনে ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু

"নারীর দৌলত সতীর ধর্ম্ম রাখতে যদি চায়
এমন পুরুষ কেহ নাই, কাড়ি লৈয়া যায়।"

পুরাতনী

ইলসা খালির পারে গফুরের বাড়ী। ঘুরিতে ঘুরিয়া আমিনা তাহার বাড়ীতে আসিল।

আশী বছরের বুড়া, সন্ধ্যাকালে সে ক্ষেতের কাজ সারিয়া হাল কাঁধে লইয়া বাড়ী ফেরে।

"আশী বছরের উমর তার,
বুড়া খেতিয়াল,
সাঁঝের বেলা বাড়ী আইসে কাঁধে লইয়া
হাল।

তাহার চোখের ভুরু পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে, বুকের রোম গুলিরও সেই দশা।

"দেড়হাত লম্বা দাড়ী দেখতে লাগে বেশ"—তাহার স্ত্রী বয়সের দরুণ কুব্জা হইয়া গিয়াছে। সে চোখে দেখিতে পায় না, তবু অদৃষ্টের দোষে সে কোন রূপে ভাতবেগুন রাঁধিয়া দেয়। গফুর বড় কৃপণ; একটি পোষ্য পুত্র রাখিয়াছিল, খোদা সেটিকেও লইয়া গিয়াছেন, তাই সে তাহার স্ত্রীকে লইয়া অসময়ে বড়ই দুঃখ পাইতেছে, তাহার গোলাভরা ধান, ঘরে মেষ বলদ হালের অভাব নাই, তথাপি সে বড় দুঃখী; আমিনাকে পাইয়া সে যেন হাতে স্বর্গ পাইল। সেই জনশূন্য গৃহে যেন স্নেহের বান ডাকিল। আমিনা দুই সন্ধ্যা কত যত্নে বুড়াবুড়িকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে লাগিল, স্নেহের গুণে এই অমৃত রান্নায় পরিতৃপ্ত হইয়া গফুরের চক্ষে জল আসিত। নানারূপ রান্নার উপাদান সংগ্রহের সময় আমিনার মৃদু স্বরে যেন

শিশুর কাকলীর মত শিষ্ট কলরবে শূন্য গৃহ মুখরিত হইতে লাগিল। "বুড়া বলে পাইলাম কন্যা আল্লার দোয়ায়"—আমিনা সাঁঝের বেলা গরু গোয়াল ঘরে বাঁধে, তাহাদিগকে কুড়া ও খৈল দেয়, পান ছেঁচিয়া দন্তহীনা ধর্ম্ম-মাতার হাতে দেয়—সে এই পথে-পাওয়া কন্যাটির গালে চুমা খাইয়া তাহার মনের পরিপূর্ণ স্নেহ জানায়। "আমিনা পরম সুখে আছে তাদের ঘরে। মা বাপের লাগি তবু চক্ষুর পানি পড়ে।"

কত দিন পরে গফুরের স্ত্রী মারা পড়িল। গফুর বিমনা হইয়া সারা দিন বসিয়া বসিয়া কি ভাবে? একদিন সে আমিনাকে ডাকিয়া বলিল; সংসারে আমার কোন বাঁধন ছিল না, এই শেষ কালে স্নেহ দিয়া তুমি আমাকে বাধিয়াছ। তোমার জন্য ভাবিয়া আমি কূল পাইনা। আমার ধন দৌলত সবই আছে, অনেক জমি জায়গা আছে। এই দুনিয়া ঠকের জায়গা, আমি মরিলে তুমি কি করিয়া এই সকল রক্ষা করিব?

"সাত বছর বয়স তোমার স্বামী নিরুদ্দেশ, আমাদের সরা (শাস্ত্রের নির্দ্দেশ) মতে তোমার স্বামীর সঙ্গে আর কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। শাস্ত্রের বচনানুসারে আপনা হইতে তোমাদের তালাক সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার কথা শুন, আমি ভাল একটি বর খুঁজি, তুমি বিবাহ কর। সে তোমাকে ও আমার সম্পত্তি রক্ষা করিবে; আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব, তাহা না হইলে তোমার ও আমার দুঃখের সীমা থাকিবে না। আমি তোমার ধর্ম্মের পিতা। আমার কথা অগ্রাহ্য করিও না।" আমিনা

মগদের একজন আসিয়া বলিল, "বুড়া বাবাজান, তুমি মিছা ভয় পাইয়াছ। পূর্ব্বে এই ভিটি আমাদের ছিল, আমরা এই আঙ্গিনায় খেলা করিয়াছি, এখানকার কত কথা আমাদের মনে আছে। হঠাৎ মুসলমানদের তাড়া খাইয়া আমরা একরাত্রে এই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হই, যাইবার সময় আমরা এই ভিটাটায় আমাদের অনেক ধন রত্ন পুঁতিয়া রাখিয়াছি। তাহাই নিতে আসিয়াছি, আমরা চোর দস্যু নই, তোমরা কোন বৃথা আশঙ্কা করিওনা।" এই বলিতে বলিতে তাহারা ভিটাটার একটা দিক খুঁড়িয়া ১২টা প্রকাণ্ড ঘড়া বাহির করিল।

মগদলপতি বলিল "ভাই গফুর, তুমি এতকাল আমাদের এই ধনের পাহারা দিয়াছ। তাহার পুরস্কার স্বরূপ দুটি ঘড়া তোমাকে দিলাম, ইহা মোহরে ভর্ত্তি। আমাদের গোপনে পলাইয়া যাইতে হইবে, ভাই সেলাম্, আমরা আর দেরি করিতে পারিতেছি না" এই বলিয়া বাকী দশঘড়া ধন লইয়া তাহারা অতি দ্রুত চলিয়া গেল।

সেই শেষ রাত্রে ঘরে আলো জ্বালিয়া গফুর ও আমিনা—বহু সহস্র মোহর পাইল। গফুর বলিল, "এইগুলি কলসীতে পুনরায় ভরিয়া আমাদের শয্যা-গৃহের মাটি খুঁড়িয়া পুঁতিয়া রাখা যাউক, যেন কেহ না জানিতে পারে, রাত্রের মধ্যে এই কাজ শেষ করিতে হইবে।"

ইহার অল্প কাল পরেই একদিন গফুর আমিনার সম্মুখে কাঁদিতে লাগিল, ধর্ম্ম-কন্যার দুইটি হাত বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমার শেষ কাল উপস্থিত। তুমি ত আমার জীবনের শেষ কয়টা দিন

আমাকে বড় সুখে রাখিয়াছিলে, আমার ধন দৌলত রৈল এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় রত্ন তুমি রহিলে” বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু উর্দ্ধে উঠিল। সেই চোখের জল আঁচলে মুছিয়া আমিনা মাটির উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন গফুরের জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। আমিনা কাঁদিয়া বলিল,—

“যেই গাছ ধরি আমি অভাগিনী নারী।
দারুণ তুফানে সেই গাছ ফেলে যে উপাড়ি।
বাপের ঘরে জন্ম লৈয়া না পাইলাম যে সুখ,
তুমি আরো ভাঙ্গি দিলা আমার ভাঙ্গা বুক॥

(৭)

এদিকে আমিনা যে ইনসা-খালির বুড়া গফুর মিঞার বাড়ী আশ্রয় পাইয়াছে, তাহার সমস্ত খবরই এসাকের গুপ্তচরেরা তাহাকে জানাইয়াছে। মায়ের গ্রাম হইতে এসাক এখন পর্য্যন্ত ষড়যন্ত্র চালাইতেছে ও আমিনাকে হাত করিবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছে। গফুর জীবিত থাকার সময় সে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু বুড়া কৃষকের মৃত্যুর পর সে এইবার সুযোগ পাইল।

সে হায়দারের স্ত্রীকে লইয়া বলিল, মা, আপনি এই বয়সে ভিক্ষা করিয়া খান, ইহা আমার সহ্য হয় না, আপনারা তো আমিনাকে, আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজী ছিলেন, আমার ভাগ্য দোষে আমিনা সম্মত হইল না, তথাপি আপনাকে আমি আমার মায়ের মতন মনে করি, আপনি আপনার এই পুত্রকে দুঃখ দিবেন না, নিজেও

দুঃখ ভোগ করিবেন না, এইরূপে নানা ছন্দোবদ্ধ কথায় বুড়ীর মন ভুলাইয়া তাহাকে নিজের বাটীতে লইয়া আসিল। রোজ দধি দুগ্ধ ও নানা সুখাদ্য খাওয়াইয়া তাহার মন খুসী করিয়া একদিন বলিল —"আমিনা ইলসা-খালির গফুর মিঞার বাড়ী আছে; অবশ্য নিজের ভিটাহারা হইয়া এবং মা বাপের আশ্রয় বঞ্চিত হইয়া সে কখনও সুখে নাই। আপনি এবার চেষ্টা করিলে তাহাকে রাজী করাইতে পারিবেন।" বৃদ্ধা বলিল, "তুমি বাপু তাহাকে যাইয়া এবার তোমার কথা বলিলে হয়ত সে সম্মত হইতে পারে, বরং বলিও আমি তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছি।" উত্তরে এসাক বলিল "মা, তুমি কেন ভুল করিতেছ, আমি সমুদ্রে সাঁতার কাটিয়া কূল পাই নাই। আমি গেলে আমিনা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে, নছিরের দোষে সে আমাকে শত্রু মনে করিতেছে, তুমি তো সকলই জান।" এইরূপ নানা কথাতে বৃদ্ধার মন আর্দ্র হইল এবং ঘন ঘন পরস্পরের আলাপে ও কথাবার্ত্তার পর হায়দারের স্ত্রী একদিন সন্ধ্যার সময় ইল্‌সা-খালি গ্রামে গফুর মিঞার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দরজায় ঘা দিল। 'কে এল কে এল' বলিয়া আমিনা দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া মাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল ও সেলাম করিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। পিতার মৃত্যুর সংবাদে আমিনা নিতান্ত শোকাকুল হইল। মাতা বলিলেন, "তুমি বিদেশ বিভূঁয়ে এখানে কেন পড়িয়া থাকিবে। বাপের ভিটা ফিরিয়া চল।" আমিনা বলিল, "সেখানে যাইয়া আমরা কি খাইব। আল্লার ইচ্ছায় এখানে আমাদের কোন অভাব নাই। এখানে

ধান বিক্রয় করিয়া যে টাকা হয়, তাহা হইতে প্রতি বৎসর অনেক জমা হয়, এ বাড়ীতে গরু ছাগল অনেক, প্রচুর দুধ পাই। আম-কাঁটালের বাগান হইতে অনেক ফল আসে, তুমি এখানে থাক, ফিরিয়া মাঝেরগ্রাম যাইয়া কি লাভ হইবে? এই বুড়া বয়সে ভিক্ষা করিয়া খাওয়া কি তোমার চলে? এখানে প্রাণ তোমার যাহা চায়—তাহাই খাইতে পাইবে। আমি এখান হইতে গেলে আমার বিষয়-আসয় জমি-জমা সবই নষ্ট হইবে, দেখিবার মানুষ নাই।" আমিনার মা সকলই বুঝিল। বুড়ী রাজি হইয়া তথায় রহিয়া গেল।

কয়েক দিন পড়ে সেখানে কয়েকটি অতিথি আসিল, বুড়ী তাহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন কি পরামর্শ করিল। দুপ্রহর রাত্রে যখন আমিনা নিদ্রিত, তখন সেই সকল লোক তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কাপড় দিয়া তাহাকে দৃঢ়ভাবে বাঁধিল, কাঁধে করিয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিল। মুখ হাত পা' বাঁধা, আমিনা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিল না। বুড়ী দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিল, গুণ্ডারা তাহারই সাহায্যে আমিনার ঘরে ঢুকিয়াছিল।

এই ভাবে গৃহ ছাড়িয়া যখন লোকের কাঁধের উপর সে নীত হইতেছিল, তখন তাহার একটি মুক্ত চক্ষুর দৃষ্টিতে তাহার গুণবতী মাতাকে দেখিল, তিনি ঘুমের ভান করিয়া ছিলেন।

অতিথি বেশী গুণ্ডারা আমিনাকে ইল্‌সা-খালির ঘাটে বাঁধা একখানি সারেন্দা নৌকার উপর তুলিয়া লইল। ছোট ছোট খাল পাড়ি দিয়া নৌকাখানি একদিনের পরে মাঝেরগ্রামে পৌছিল এবং আমিনা এসাকের বাড়ীতে আনীতা হইল।

মাঝেরগা হইতে দুঃসংবাদ শুনিয়া বিষণ্ণচিত্তে [illegible] নিজের স্..পে আসিয়া বসিল। তখন ফাল্গুনে হাওয়ার বেগ আরো বাড়িয়াছে। সমুদ্রকে যেন কোন দৈত্য দানব উড়াইয়া লইয়া যাইবে এই সঙ্কল্প করিয়া বিষম চীৎকার করিতেছে। নছর মাঝি মাল্লাদিগকে জাহাজ চালাইতে আদেশ করিল; তাঁহারা আকাশের অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু নছর কারো কথা [illegible] না, তাহার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। এই ঝড়ের [illegible] বেপরোয়া জাহাজ চালাইতে জেদ করিল; ছোট নদী ও খাল ছাড়িয়া যখন তাহারা অসীম নীলাম্বু বক্ষে আসিয়া পড়িল তখন প্রকৃতির কি দুর্দ্দান্ত রুদ্র মূর্ত্তি! মাঝিরা ভাবিল,—পতঙ্গ যাইয়া আগুনে ঝাঁপিয়া পড়ে যে অদৃষ্টের ফলে,—তাহারাও সেইরূপ এই করাল মৃত্যুর মুখে আসিয়া স্বেচ্ছায় পড়িয়াছে—তাহাও সেইরূপ অদৃষ্টের ফলে।

আকাশে কি ভীষণ বজ্রের শব্দ ও মেঘের হাঁকডাক। কালো কালো মেঘগুলি এক একটা কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত আকাশ আলোড়ন করিয়া দাপাদাপি করিতেছে। একে ত তাহারা উজান চলিয়াছে—তাহার পর ক্রমেই ঝড়ের গতি বাড়িতেছে। আরোহী প্রমাদ গণিল। দুই দিক হইতে পাহাড়ের মত ঢেউ জাহাজখানি আক্রমণ করিল। উহা জলের উপর মোচার খোলার মত টলমল

করিতে লাগিল। মাঝিরা বদরের সিন্নি মানৎ করিল, বাড়ীতে যে সকল শিশুদের ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের জন্য মাথা থাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতামাতা ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়ের সঙ্গে আর দেখা হইল না বলিয়া কেহ কেহ বিলাপ করিল। "প্রাণপ্রিয়া পেয়ারী বিবির সঙ্গে আর দেখা হইল না, অকুল সমুদ্রে মৃত্যু আমার লেখা ছিল" এই বলিয়া এক মাঝি জাহাজের পাটাতনের উপর পড়িয়া ধড়ফড় করিতে লাগিল। নছরকে গালাগালি দিয়া বলিল "গাঁজাখোরের হাতে পড়িয়া নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও এইরূপ ঝড়ের সময় সমুদ্রে আসিলাম—মৃত্যুর পর কবরের মাটী, কাফেন প্রভৃতি আমার অদৃষ্টে নাই, কেহ জানজা পড়িয়া আমার একটা সদ্গতি করিতে দাঁড়াইতে আসিল না।

ক্রমে তুফানের ভীষণ শব্দে মাঝিদের কান্নাকাটি আর শোনা গেল না। বাতাস আসিয়া মোচড়াইয়া মাস্তুল ভাঙ্গিল, পালের দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিল, তারপর জাহাজখানিকে ঠেলিয়া অনির্দ্দিষ্ট দিকে দুর্দ্দমনীয় বেগে লইয়া চলিল। মাতালের মত জাহাজখানি টলিতে টলিতে "গোবৈদ্যার চরে" আনিয়া ঠেকাইল।

এই গোবৈদ্যার চর অতি ভীষণ স্থান, এখানে ছোট ছোট ডিঙ্গায় শত শত হার্ম্মাদেরা (পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা) লুকাইয়া থাকে। এখানে কোন জাহাজ একা আসে না, লাঠি, ঢাল, ছোরা, প্রভৃতি নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া জাহাজের খালাসীরা অনেক জাহাজ একত্র চালাইয়া 'বহর', করিয়া আইসে। একজন 'বহরদার" সেই সকল জাহাজ পরিচালনা করে। নছর মালুমের ছিন্ন ভিন্ন

ভাঙ্গা জাহাজ খানি বাতাসের জোরে এই ভয়ঙ্কর স্থানটিতে আসিয়া পৌছিল। হার্ম্মাদেরা এখনই যে উহাকে বাঘের মত ছিঁড়িয়া খাইবে।

পূব দিকে কাঁইচা নদী—জলের তোড়ে জাহাজখানি ... বিস্তার বালুর চরে প্রবেশ করিল। এখন ভাটীর সময় হইয়াছে, আবার জোয়ার না বাড়িলে জাহাজ ডাঙ্গা হইতে জলে নামিবে না। কাজেই দুর্দ্দান্ত হার্ম্মাদেরা থাপ পাতিয়া আছে। আরোহীদের ভয়ে মুখ শুকাইয়া গেল। তাহারা খাবার চিন্তা ছাড়িয়া দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত বহুমূল্য মালগুলি পাহারা দিতে লাগিল—তাহাদের একমাত্র চিন্তা তাড়াতাড়ি কোন দিক্ দিয়া পাড়ি দেওয়া যাইতে পারে কিনা?

ক্রমে একটু একটু করিয়া জল বাড়িয়া তাহাদের মনে আশার সঞ্চার করিল। অরুণরাগে আকাশের পূর্ব্ব প্রান্ত রঞ্জিত হইয়া উঠিল। নছর মালুম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, চরা... ...শ্চিম দিকে ছোট ছোট মানুষের মূর্ত্তি তাহার স্থূপখানির ... শ্যেন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহাদের প্রত্যেকের হাতে ... একটি দূরবীন। দশ বারো জন দস্যু সম্মুখে আসিয়া পড়ি... তাহাদের কটিতে ছোট ছোট প্যান্ট (ল্যাঙ্গী), তাহা... কাহারো গায় লাল কুর্ত্তা, মাথায় পাগড়ী, কোমরে তলোয়ার ... এবং হাতে বন্দুক, তাহাদের ছোট ছোট মূর্ত্তিও যেন জীব... ...ক একটি বন্দুক। তাহাদিগকে দেখিয়া নছরের বুকের রক্ত ভয়ে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। মাঝি, মল্লা ও টেণ্ডেলের অবস্থার কথা কি বলিব। তাহারা একটু নড়িতে চড়িতে পারিল না, তাহাদের

শরীরে কোন বল নাই—মড়ার মত স্‌ুপের এক কোণে পড়িয়া রহিল। হার্ম্মাদেরা নছরের গলা চাপিয়া ধরিল এবং তাহার গণ্ডে ভীষণ চপেটাঘাত করিল। সে অজ্ঞানের মত পাটাতনের উপর পড়িয়া রহিল। মাঝিদের হাত, পা, গলা দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া জাহাজের এক কোণে ফেলিয়া রাখিল, তাহারা টু শব্দ করিতে পারিল না, ভয়ে সে বলটুকুও তাহাদের ছিল না।

এদিকে জোয়ার বাড়িল, জল ফুলিয়া উঠিল। "লাউখা" মাছের গন্ধে পাঙ্গের পায় বা পঙ্গপালেরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসিল এবং তাহার অব্যবহিত পরেই সহস্র সহস্র গাঙ্গ চিল ও শকুন সেই মাছগুলি ঠোঁটে করিয়া পাখা ঝাপ্টাইয়া আকাশে উড়িতে লাগিল। এদিকে হার্ম্মাদেরা নছর মালুমের সিন্ধুক খুলিয়া প্রচুর ব্রহ্মদেশীয় সোনা পাইয়া খুসি হইল। আর আর মূল্যবান দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া তাহারা তাহাদের ডিঙ্গিতে চলিয়া আসিল।

হাত পা বাঁধা নছর ও তাহার সহযাত্রীকে দস্যুরা সঙ্গে লইয়া গেল এবং সমুদ্রের পশ্চিম প্রান্তে এক দেশে তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। নছর মালুমের অভিজ্ঞতা বুঝিয়া তাহারা তাহাকে বেশী দামে বেচিল। হার্ম্মাদেরা সেই সকল লুণ্ঠিত দ্রব্য ও মানুষ-বেচা টাকা পাইয়া হৃষ্ট মনে স্বীয় স্বীয় স্থানে চলিয়া গেল।

যে ব্যক্তি নছরকে কিনিয়াছিল, তাহার গৃহে সে ক্রীতদাস হইয়া রহিল। সে তাহাদের হাট-বাজার করে এবং প্রয়োজনানুসারে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইয়া প্রভুর আদেশ পালন করে। তাহার প্রভু তাহাকে একখানি ছোট নৌকা দিয়াছিল। নছর

সেই নৌকা বাহিয়া প্রভুর নির্দেশ মত সেই অঞ্চলে আনা-গোনা করে।

কিন্তু এই দাসবৃত্তি তাহার অসহ্য হইল। সে একদিন নৌকা-খানি লইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িল। তাহার প্রাণের মায়া একটুও ছিল না: সে ক্রমাগত সমুদ্র দিয়া নৌকা চালাইতে লাগিল। একদিন দুই দিন করিয়া চারদিন সে রাত্রিদিন অনাহারে অনিদ্রায় নৌকা বাহিতেছিল। কিন্তু জল ছাড়া স্থলের মুখ দেখিতে পাইল না। বৈঠা বাহিতে বাহিতে তাঁহার হাত ফুলিয়া এমন হইল যে আর সে নৌকা বাহিতে পারিল না। ক্রমাগত উপবাস করিয়া নছর একবারে বলহীন হইয়া পড়িল।

নছরের মাথা ঘুরিতেছিল, তাহার চোখের দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছিল,—আর যে সে নৌকাখানি ঠিক রাখিতে পারে না, সে মনে মনে আল্লাজীকে ডাকিতে লাগিল, এই অবস্থায় সে বেহুঁস হইয়া মৃতের মত পড়িয়া রহিল। বুঝিবা সমুদ্রের পীরের দয়া হইল। সহসা একখানি বৃহৎ সুলুপ তথায় উপস্থিত হইল। মাঝিরা দেখিল একটি ছোট নৌকা মাঝ দরিয়ায় ভাসিতেছে—সেই ক্ষুদ্র নৌকাটি একবারে পরিত্যক্ত ও সহায়হীন। মাঝিরা তথায় যাইয়া দেখিল একটা মানুষ সেই নৌকাটিতে মৃতের মত পড়িয়া আছে। তাহারা অনেক সেবা শুশ্রূষা করিয়া ও ডাবের জল খাওয়াইয়া তাহাকে চেতন করিল। কিন্তু নছর তাহাদের কথা বুঝে না ও মাঝিরাও তাহার কি অবস্থা হইয়াছে তাহা জানিবার কোন উপায় পাইল না। আকার-ইঙ্গিতে যতটা পারিল, তাহার দুরবস্থার কারণ একটা

অনুমান করিয়া লইল। এই সময় একটা পূর্ব্ব দেশীয় ধান বোঝাই সুপ সেখানে আসিয়া পৌছিল। নছরের উদ্ধার কর্ত্তা জেলেরা সেই সুপের লোকদিগের হেপাজতে নছরকে দিয়া গেল।

এক বছর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া মাফো সদাগর, নছরের আশা ছাড়িয়া দিল। সে তো 'লাউঞা' মাছ কিনিতে পরীদিয়াতে গিয়াছিল, দুই মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছিল।

মাফো ভাবিল, নিশ্চয় টাকা পয়সা লইয়া ও বাণিজ্য-লব্ধ বেসাতি লইয়া সে নিজের দেশে চলিয়া গিয়াছে।

এই চিন্তার পর নছরের যে কারবার অঙ্গী-সহরে ছিল, সেই কারবারের সমস্ত মাল নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিয়া নছরের কারবার বন্ধ করিয়া দিল।

কিন্তু এই দেশী মেয়ে-পুরুষ কেবল টাকার জন্য মরে। দাম্পত্য প্রেম ইহাদের কাছে একটা কথার কথা মাত্র। মাফো "ভিংচা" জাতীয়, ইহাদের বন্ধুত্ব ও স্নেহ বন্ধন অল্প কিছুতেই টুটিয়া যায়। মাফো একিনের জন্য নূতন বর খুঁজিয়া আনিল এবং তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহ দিল।

একবছর পরে নছর অঙ্গী সহরে ফিরিয়া সে-সমস্ত কথাই শুনিল। একিনের জন্য প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল, কিন্তু সে নূতন স্বামীর ঘর করিতেছে। নছর আর তাহার মুখ দেখিতে চাহিল না।

সে হৃত-সর্ব্বস্ব, ছেঁড়া লুঙ্গী পরা, দুঃখে কষ্টে সে কঙ্কালসার।

তাহার হাতে একটি পয়সা নাই, কোথায় শুইবে [illegible] ছোট কুঁড়ে নাই। রাত্রে পাগলের মত খড় দিয়া বালিস করিয়া—গাছ-তলায় শুইয়া থাকে। পূর্ব্ব জীবনের সমস্ত কথা মনে পড়িলে সময়ে সময়ে তাহার চোথ দুটি জলে ভরিয়া যায়।

একদিন স্বপ্নে দেখিল—আমিনা যেন আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার দুটি চক্ষের তারা নীল আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে, সে তাহার ধর্ম্ম, কুলশীল রক্ষা করিয়াছে, সে নিষ্পাপ, স্নেহময়ী, সতীত্বের একটি প্রদীপ শিখার মত জ্বলিতেছে।

"বুকেতে দরদ তার মুখে মৃদু হাসি।
এই ফুল ঝরা নহে, নহে ইহা বাসি।"

স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া দেখিল তাহার চক্ষে মুক্তার মত অশ্রু টলমল করিতেছে। আমিনাকে দেখিবার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে প্রভাত না হইতে হইতেই মায়ের গাঁয়ের দিকে রওনা হইল।

(৯)

আমিনাকে জোর করিয়া গৃহে আনিয়া এনাক তাহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইল, কিন্তু আমিনা কিছুতেই পোষ মানিল না।

"না মানিল পোষ কন্যা না মানিল পোষ।
জংলী সাপের মত করে ফোঁস ফোঁস।"

এদিকে বৃধা ওঝার সমস্ত মন্ত্র তন্ত্র বৃথা হইয়া গেল, কত তাবিজ কবচ ও মন্ত্রপূত তৈল—আমিনার প্রতি প্রয়োগ করা হইল —কিন্তু তাহার একগাছি চুলও টলাইতে পারিল না।

"দোয়া তাবিজ কৈল, কৈল দারু টোনা
আগুনে পুড়িলে ভাই চিনা যায় সোনা"

ছয়মাস এইরূপে নানা চেষ্টা করিয়া এসাক বুঝিল, এই পাষাণ-প্রতিমার বুকে একটি রেখা টানিবার মত শক্তি তার নাই, সে তাহার প্রতি বিরূপা। সে যতই আদর দেখাইতে যায়, ততই তাহার প্রতি তাহার বিরক্তি ও ক্রোধ বৃদ্ধি হয় মাত্র। ছয়মাসের পর সে হাল ছাড়িয়া দিল, মানুষ এই ভাবে আর কত সহিতে পারে?

একদিন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যার রক্তিম আভার সঙ্গে এসাকের হৃদয়ে অনুরাগের শেষ চিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে, সে আমিনার ঘরে যাইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল:—"দেখ আমিনা, তুমি সামান্য লোকের মেয়ে, হৃদয়হীনা, নির্ম্মম এবং রূঢ়-প্রকৃতি, আমার তোমাকে দিয়া কোন কাজ নাই।"

"আমার ঘরেতে তোমার নাহি আর জায়গা
বড় পেরাসন দিলে পাইলাম বড় দাগা,"

তোমার উপর আমার স্ত্রী মেনাজান বিবি বড়ই চটিয়া গিয়াছেন, তোমাকে তিনি আর এক দণ্ডও এ বাড়ীতে থাকিতে দিবেন না। ইহার পরে—

"বাহির করিয়া দিবে চুল ধার টানি।
আমার ঘরে না পাইবে ভাত আর পানি।

এই কথা শুনিয়া আমিনা তখনই ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। তাহার আঁচল ধূলায় লুটাইতেছে, বেণী পিঠের উপর দুলিতেছে— চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে আমিনা, তাহার বাপের ভিটায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ভিটায় আর ঘর নাই, ঘরের দুই একটা খুটি সমাধি স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া আছে। এখানে ভাঙ্গা চালের নীচে খানিকটা ভাঙ্গা বেড়া পড়িয়া আছে। রাত্রে শিয়ালে সেইখানে গর্ত্ত করিয়া শুইয়া থাকে এবং আঙ্গিনায় রাশি রাশি আবর্জ্জনা জড় হইয়াছে। সে এখানে কোথায় থাকিবে, সারারাত্রি ভিটার একটি কোণে ঠায় বসিয়া রহিল। ঐ সময় সোনার থালার মত আকাশের এক প্রান্তে অর্দ্ধেক চাঁদ উদিত হইল,—জ্যোৎস্না জালে ভিটাটা প্লাবিত হইল।

ভীতনেত্রে আমিনা দেখিতে পাইল দুশ্চরিত্র এসাক ধীরে ধীরে সেই নির্জ্জন স্থানে আসিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া আমিনা শিহরিত হইয়া উঠিল। বাঘের নিঃশব্দ পদচারণে হরিণী যে আতঙ্কিত হয়—আমিনা এসাককে দেখিয়া তেমনই উৎকণ্ঠিত হইল

আমিনাকে তাড়াইয়া দিয়া এসাকের মনে সোয়াস্তি ছিল না জ্যোৎস্নালোকে পুনরায় তাহার মনের লালসা জাগিয়া উঠিয়াছে সে ঘরে রহিতে না পারিয়া এই ভিটায় আসিয়াছে।

যখন এসাক আমিনাকে ধরিতে যাইবে, তখন অব ... আর্ত্তনাদ করিয়া সে মাটিতে পড়িয়া গেল, কে যেন পশ্চাৎ হইতে তাহার মাথায় লাঠির বাড়ি মারিয়াছে।

এই আগন্তুক নছর, দিনের বেলায় না আসিয়া সে মধ্য-রাত্রে

আমিনা

আমিনার ভিটাটা দেখিতে আসিয়াছিল এবং সেই বাড়ীর এক কোণে বসিয়া কাঁদিতেছিল। সহসা জ্যোৎস্নায় নছর দুষ্ট এসাকের কীর্ত্তি দেখিতে পাইয়া লাঠিটা লইয়া তাহাকে তাড়া করিয়াছে। বিষম আঘাতে এসাক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল।

—আমিনা উঠিয়া আসিয়া তাহার স্বামীকে আলিঙ্গন করিল, আমিনার মুখে একটি কথা নাই, চোখে অশ্রুরাশি। এদিকে নছরের পরণে একখানি ছেঁড়া নেকড়া, বহুদিনের অনশনে, দুশ্চিন্তা, দুঃখ ও রাত্রি জাগরণে সে কঙ্কালসার। তাহার মুখ দেখিয়া আমিনার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, সে স্বামীর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিল—

"মাথার চুল দিয়া চরণ লইল নিছনি।
কেমন ছিলে ভুলে মোরে আমার নয়ন-মণি
কিছু না কহিল নছর না কহিলা কিছু
ঘরের বাহির হৈয়া গেল কন্যার পিছু পিছু।"

নূরন্নেহা

পুত্র-বিয়োগে

(১)

দেবাং পাহাড়ের নিম্ন ভূমিতে নজু মিঞা একজন বড় মোড়ল ছিল; সে ধর্ম্মভীরু ও কোরাণ সরিফের মর্ম্মগ্রাহী ও সচ্চরিত্র বলিয়া সকলে তাহাকে সম্মান করিত। পাহাড়তলীতে তাহার অনেক খেত খামার ছিল; সে স্থানটি বড় উর্ব্বর, একগুণ ফসল আশা করিলে চতুর্গুণ ফসল হইত। বীজ ধান ছিটাইয়া দিলেই জমি শ্যামবর্ণে শোভিত হইয়া উঠিত, ফসল পাকিয়া উঠিলে সূর্য্যাস্তের সময় আকাশ ও ভূমিতল আরক্ত ধূসর বর্ণে রাঙ্গা হইয়া যাইত। নজু মিঞা কোরাণের প্রত্যেকটি বিধি-নিয়ম মানিয়া চলিত। তাহার গোলাভরা ধান ও পুকুর ভরা মাছ ছিল। বাড়ীর পেছনে ফলের বাগিচা ও নিকটবর্ত্তী কাইচা নদীতে বিস্তর গধু, ভাওয়াইলা ও বালাম নৌকা বাণিজ্য-পথে চলা-ফেরা করিত। ধানচালের ব্যবসা করিতে সে প্রায়ই সমুদ্রে যাতায়াত করিত এবং দূরদূরান্তরে যাইত।

কিন্তু মানুষের ভাগ্য চিরদিনই একরূপ থাকে না। একদা ভয়ানক তুফানের মধ্যে তাহার বালাম নৌকাটি প্রায় ১৬ হাজার মণ ধান লইয়া কাইচা নদীর আবর্ত্তে আসিয়া পড়িল। ফাল্গুন মাসের ঝড়ের তোড়ে কাইচার জল বড় বড় ঢেউ লইয়া তাণ্ডব নৃত্য

করিতেছিল। নজু মিঞার ধান বোঝাই নৌকা নদী পাড়ি দিতে যাইয়া সেই ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যে টাল সামলাইতে পারিল না। এক ঢেউএ সেই বিশাল নৌকা যেন পাহাড়ের চূড়ে উঠিল, তারপর চক্রাকৃতি ঘূর্ণি বায়ু মাস্তুল সহ নৌকাখানিকে পাতালে লইয়া চলিল। মাল সমেত নজু মিঞা এই ঘোর তুফানে নৌকা ডুবি হইয়া প্রাণ দিল।

বাড়ীতে তাহার একটি কিশোর বয়স্ক পুত্র ছিল, তার নাম মালেক। নজুর বৃদ্ধা মাতার বয়স ৮০। নজু এই বুড়ির নয়নের মণি ছিল। পুত্র হারাইয়া বুড়ী নিত্য কাইচা নদীর তীরে আসিয়া পারের উপর লুটাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিত। নদীতে জোয়ার দেখিলে তাহার শোক বাড়িয়া যাইত। সেই নদীতে বড় বড় কুমীর ঝড়ের সময় 'হুত' 'হুত' রবে নদীর উপর মুখ উঠাইয়া অদ্ভুত শব্দ করিত, সে শব্দের সঙ্গে স্বর মিশাইয়া বুড়ী 'পুত' 'পুত' বলিয়া কাঁদিত। আশী বছরের বুড়ীকে নাতিটির জন্য দুইবেলা রাঁধিতে হয়। বুড়ী চোখের জলে ভিজিয়া, উনুনের আগুনে হাত পুড়িয়া নাতিটির জন্য রাঁধে এবং কাইচার ঢেউএর শব্দ শুনিলে বিলাপ করিয়া বলে, "বাছাধন, ভাটায় তোর নৌকা ফিরিল না, কত জোয়ার চলিয়া গেল, আমি তোর চাঁদ মুখখানি আর দেখিলাম না, আমার প্রাণের পুত্রকে কোন্ হাঙ্গর বা কুমীরে খাইল, বাছার মুখে মা ডাক আর শুনিলাম না, আমার কলিজা পুড়িয়া যাইতেছে, আমার এত সাধের বুকের ধন মালেককে তুই সাদি করাইয়া গেলি না—

নূরন্নেছা

"আশী বছরের বুড়ী দুই ওক্ত রাঁধে।
নদীতে জোয়ার আইল
বুক কুটি কাঁদে।
কাঁদে বুড়ী রব ধরি শুনিতে অদ্ভুত।
হাড়িয়া কুমীরের মত করে "হুত, হুত" ॥
জোয়ারে না আইলিরে পুত
ভাটায় না আইলি।
কোন্ হাঙ্গরে, কোন্ কুমীরে আমার
পুতেরে খাইলি ॥
নাতীরে লইয়া বুকে কাঁদিত রে দাদী।
চেংরা নাতিরে মোর না করালি সাদী ॥"

অষ্ট প্রহর সেই বৃদ্ধার চীৎকারে পল্লীটি মুখরিত হইত। এইভাবে লোক কতকাল বাঁচিতে পারে? একদিন বুড়ীর মনের আগুন চিরতরে নিবিয়া গেল। 'দাদী', 'দাদী' বলিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দনশীল মালেকের দিকে নিশ্চল চক্ষু দুটি রাখিয়া তাহার দাদীর প্রাণ বায়ু চলিয়া গেল।

(২)

কিশোর কিশোরী

মালেক এখন একান্ত নিরাশ্রয় ও অনাথ; বাড়ীতে সকলই আছে, কিন্তু কে তাহাকে খাইতে দেয়, কেইবা দুটি ভাত রাঁধিয়া দেয়! নজুর বাড়ীর মাত্র একখানি ক্ষেতের ওপারে আজগর মিঞার বাড়ী, তাহার একমাত্র কন্যা নূরন্নেহা। সে কিশোর বয়স্কা—একখানি রূপের ডালি। আজগর মিঞার সঙ্গে নজুর ভাল ভাব ছিল না,—উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা অনেকদিন বন্ধ ছিল, এ বাড়ীর কেহ ও বাড়ীতে যাইত না, ও বাড়ীর লোক এ বাড়ীতে আসিত না। কিন্তু এই নিরাশ্রয় বালকের গৃহে যখন পিতা মাতা ও পিতামহীর স্নেহের দাগ সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে,—বালিসে মাথা গুঁজিয়া দাদীর শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে যখন তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে,—তখন সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী কিশোরী তাহার শিয়রে বসিয়া কত স্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিত। নূরন্নেহা আসিয়া তাহার ভাত-বেগুন রাঁধিয়া দেয়, তাহার শয্যা প্রস্তুত করে, তাহাকে সরবৎ করিয়া খাওয়ায়। মালেক দেখিত প্রাতঃকালে সদ্য-স্নাতা নূরন্নেহা তাহার ঘরখানি লেপিয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মাটীর কলসী কাইচার শীতল জলে পূর্ণ করিয়া ঢাকনি দিয়া ঢাকিয়া শয্যার পার্শ্বে সারি সারি সাজাইয়া রাখিয়াছে।

মোট কথা, নজু মিঞার মৃত্যুর পরে আজগরের ভাবও যেন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে, সে যেন নিজেও পুত্রস্নেহে মালেককে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। নূরন্নেহার মাতা মালেককে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছে বসাইয়া রাখেন, তরমুজ ও ফুটি কাটিয়া খাইতে দেন। তাহার জন্য ঘন আউটা দুধের সর তুলিয়া রাখেন। গ্রীষ্মের সময় আখ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া জলে ভিজাইয়া তাহাকে খাইতে দেন, এবং উৎকৃষ্ট "গিরিং" চাউল গুড় ও দুধ দিয়া, সুস্বাদু পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া রাখেন।

আজগর মিঞা দ্বিপ্রহরের সময় ক্ষেতে যাইত; মালেক হুঁকা-কল্কে লইয়া তাঁহার পিছন পিছন ছুটিত। দুইজনে একত্র খাটিত ও সন্ধ্যাকালে একত্র বাড়ীতে আসিয়া নূরন্নেহার মায়ের হাতের কত যত্নের রান্না 'গিরিং' চালের ভাত ও চিংড়ি মাছের ছালুন একত্র সামনা-সামনি বসিয়া পিতাপুত্রের মত খাইতে বসিত। নূরন্নেহা তখন কাইচার জলে স্নান করিয়া জল ভরা কল্‌সী কাখে বাড়ী ফিরিত এবং বাঁশের ঝাঁপের আড়াল হইতে মালেকের মুখখানি দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইত। হায়, সেই সকল দিন কত সুখেরই না ছিল! কোন কোন দিন মধ্যাহ্নে যখন নূরন্নেহা গরুগুলিকে ঘাস-জল দিত, হয়ত সেই সময় মালেক বহির্ব্বাটীতে ঘুমিয়া আছে—সে জাগিয়া দেখিত নূরন্নেহা একখানি পাখা লইয়া তাহার শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছে; কোন কোন দিন মালেক দুপ্রহরে নদীর তীরে বসিয়া বাঁশী বাজাইত, গৃহ কর্ম্মে ব্যস্ত নূরন্নেহার কর্ণে সেই বাঁশীর সুর মধু বর্ষণ করিত। আহারের

পর লঙ্গ এলাচী দিয়া নূরন্নেহা গোলাপী খিলি তৈরী করিত, মালেক তাহার দু-একটি পাইয়া কত খুসী হইত। কিশোর-কিশোরী এইভাবে যেন দুইটি কোরকের মত এক বৃন্ত আ— করিয়া যৌবনাগমে সম্যক্ বিকশিত হওয়ার প্রতীক্ষায় ধীরে ধীরে বাড়িতেছিল।

(৩)

বন্যা ও দুর্ভিক্ষ

সেই অঞ্চলে ঢলের জলে সেবার হঠাৎ সকলের সর্ব্বনাশ হইল। কালা-পানির অথৈ জলে প্রকৃতি কত রকম খেলাই খেলেন, জলপ্লাবনে হঠাৎ কত সমৃদ্ধ দ্বীপ ভাসিয়া যায়; কোথাও পলি-মাটি জমিয়া নূতন চরের সৃষ্টি হয়, কত ছোট ছোট দ্বীপের উৎপত্তি হয়, কত দ্বীপ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়—শত নদ-নদী লইয়া যখন গঙ্গা সমুদ্রে যাইয়া পড়েন, তখন সেখানে কত উর্ব্বরা — ভূমির আবির্ভাব যেরূপ আকস্মিক হয়, তাহাদের তিরোভা— —তেও সেইরূপ বিলম্ব ঘটে না।

এবার প্লাবনের তোড়ে আজগর মিঞার বাড়ী ঘর —সিয়া গেল। একে বহুদূর ব্যাপী বানের জল, তার উপর সাঁ সাঁ শব্দে তুফানের হাঁকাহাঁকি—দেশ উজাড় হইল, জলস্থল একাকার হইয়া গেল, হাট-ঘাট-ভাসাইয়া নিল, দোকান পশার নবন নষ্ট হইল। মৌলভির কোরাণ ভাসিয়া গেল, বারুইদের পানের ঘর নষ্ট হইল,

নূরন্নেহা

অবস্থাপন্ন ব্যক্তির ধন-দৌলত জলে ডুবিল। জেলেদের জাল, জোলার তাঁত ও ধুপীর তক্তা ভাসিয়া গেল।

"ধনীজনের ধন নিল আর মাল মত্তা,
জেলের জাল জোলার তাঁত ধুপীর নিল তক্তা।"

কেহ কেহ তুফানের বেগে বন্যায় ভাসমান ঘরের চাল আশ্রয় করিয়া রহিল এবং সেই চাল সহ যাইয়া অকূল সমুদ্রে পড়িল।

গরু মৈল, মহিষ মৈল, তুফান হৈল ভারি।
ধানের দর চড়িয়া হৈল টাকায় পাঁচ আড়ি॥ *
"কেহ বেচে স্ত্রী পুত্র কেহ বেচে মাইয়া।
পেট ফুলিয়া মরে কেহ পাতা সিদ্ধ খাইয়া॥
আজগরের দুঃখের কথা কি কহিব আর।
ঘরে নাই ক্ষুদের কণা উপাশে দিন যায়॥
ভিটায় নাইরে ঘরের খুটি আর নাই চাল।
বন্যায় ভাসিয়া গেছে যত মালা মাল॥
জায়গা জমিন পড়ি রইল না হৈলরে চাষ।
গাঙ্গে ভাসে বিলে ভাসে শত শত লাস॥
মালেক কোথায় গেল নাইরে খবর।
তার লাগি বহুৎ দুঃখ পাইল আজগ ॥"

---

* পাঁচ আড়ি অর্থাৎ টাকায় দুই মন, এই দর অসম্ভব রূপ চড়া বলিয়া সেকালে বিবেচিত হইয়াছিল।

(৪)

রংদিয়া

একদিকে সেই বিরাট জলদেশে ঝড় তুফান ও বন্যার ধ্বংসলীলা, অপর দিকে পূর্ব্বসমুদ্রে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি উর্ব্বর চরা জলগর্ভে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই নূতন চরা ভূমির নাম হইয়াছে 'রংদিয়া'—লোনাজল কখন আসিয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় লোকেরা শত শত ক্ষেতের বাঁধ দিয়াছে। একমুঠো বীজ ধান ছিটাইয়া দিলে সেই সকল ক্ষেতে অফুরন্ত ফসল হয়। সেখানকার গরু ও মহিষ গুলির গা চকচকে, তাদের গায়ের উপর যেন তেল ভাসে, সেগুলি খুব বলবান ও হৃষ্টপুষ্ট। রংদিয়ার চরকে মাছের রাজ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, 'লেটা' 'রিস্তা' 'বেলে' 'ক্যাসা' 'কোড়াল' 'বোয়াল' 'চাঁদা' 'চিংড়ি' প্রভৃতি কত রকমের অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ মাছের সেই স্থানটি যেন একটা আড়ং। হাঙ্গর কুমীরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া মানুষেরা সেখানে মাছ ধরে। অল্পদিনের মধ্যে বহুদেশের জেলেরা এই স্থানে আসিয়া বাস স্থাপন করিল এবং একটা বৃহৎ মাছের কারবার স্থাপন করিল, রোসাঙ্গ (আরাকান) হইতে অনেক কৃষক ও ভূস্বামী রংদিয়ার চরে চাল ও ধানের ব্যবসা খুলিল। ক্ষেত্র-স্বামিগণ সেখানে লাঙ্গল লইয়া মহিষ দিয়া চাষ করিতে আরম্ভ করিয়া বিস্তর লাভবান হইল।

নূরন্নেহা

গৃহ-হারা বন্যা-পীড়িত আজগর মিঞা তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া আসিয়া এই নূতন চরায় ধান-চালের কারবার স্থাপন করিল, নূতন জমি জলের দরে বিক্রীত হইতেছিল ; রংদিয়ার জমিদার তথায় যাহাতে বেশী লোকে বসতি স্থাপন করে, তজ্জন্য মুক্ত হস্তে জমি বিলি করিতে লাগিলেন। আজগর মিঞা এক দ্রোণ ভূমি বিনা মূল্যে পাইল, কোন নজর দিতে হইল না—তাহা ছাড়া জমিদার তাহাকে হালের গরু দিলেন, দশ আড়ি বীজ ধান্যও সে বিনামূল্যে পাইল। জমির আশ্চর্য্য ফসল পাইয়া সে চমৎকৃত ও আনন্দিত হইল। নূরন্নেহা ও তাহার মাতাকে লইয়া সে সেইস্থানে বাস স্থাপন করিল।

সে শ্রম-বিমুখ ছিল না। সারাদিন সে লাঙ্গল লইয়া "হে-বা তিথি" শব্দে মহিষগুলি পরিচালনা করিত। "হেবা-তিথি ডাক দিয়া শেষে জোড়ে হাল।" কেবল তাহাদের একটা বড় দুঃখ এই যে মালেকের সন্ধান তাহারা পাইল না। নূরন্নেহার মাতা মালেকের জন্য প্রায়ই বিমনা হইয়া থাকেন ও নূরন্নেহা দূর পশ্চিমদিকস্থ দেয়াং পাহাড়ের জলপ্লাবিত নিম্ন ভূমি,, যাহাতে এক সময় তাহাদের বাড়ী-ঘর ছিল, সেইদিকে দুটি চোখের নিশ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া কি ভাবে ; এইভাবে তাহার কোন কোন দিন চার দণ্ড, পাঁচ দণ্ড কাটিয়া যায়—সময়ের গতির দিকে তার হুঁস থাকে না।

ষোল কাণিতে এক দ্রোণ, এক এক কাণি ১½ বিঘা।

(৫) পুনর্মিলন

একদিন সাঁজের কালে নূরন্নেহা কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছে—রংদিয়ার চরে কারবারী লোকের সমাগম ও কোলাহলে মুখর,—নূরন্নেহা বিমনা হইয়া একা চলিয়াছে, এমন সময় কে এক পথিক পেছন হইতে তাহাকে ডাকিল। নব-যৌবনে তাঁহার মূর্ত্তি শ্যামল শোভায় বড়ই সুন্দর দেখাইল। তাহার মুখে চাপ-দাড়ি, দক্ষিণ বাহুতে রেসমী সুতা দিয়া রূপার তাবিজ বাঁধা। এই যুবক দেয়াংগ্রামের সেই মালেক। মৃদুস্বরে মালেক বলিল, "বোন্, আমাকে বুঝি তোমার মনে নাই। আমি কিন্তু তোমার কথা দিন রাত ভাবি,"

"বাধিলে না বাঁধন যায় মন আমার বৈরি।
রাত নিশিতে তোমার কথা ভাবি ভাবি মরি॥
বুকে নাই পানির তৃষ্ণা পেটেতে নাই ক্ষুধা।
দিন রাইত তোমার কথা ভাবি আমি সুধা।
খানা-পিনার সুখ নাই চোখে নাই ঘুম।
রাজাই, কাঁথা গায় দিয়া না পাই যে উম॥
নছিব আমার ভালা কন্যা নছিব আমার ভালা॥
এমনি কালে পথে তোমায় পাইলাম একেলা॥
দোলে তোমার আঁচলখানি দখিনালী বায়।
তোমার দিকে চাইতে আমার কলজা ফেটে যায়।"

সেই বাঁশতলায় ছোটকালের দুজনের খেলা, নূরন্নেহারের যত্নে যে শৈশবে অসহায় অবস্থায় জীবন-লাভ করিয়াছে, সে সকল দিনের ইঙ্গিত দিতে যাইয়া তাহার চক্ষু দুটি অশ্রুপূর্ণ হইল।

মৃদুস্বরে তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ ঘোমটায় মুখ আবৃত করিয়া নূরন্নেহা বলিল ;

"তোমার কথা মনে আমার পড়ে রাত্রি দিন।
তোমার মনের মাঝে পাইবা আমার মনের চিন॥"

সে বলিল—এই জনসঙ্কুল পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া কথা কওয়া উচিত নহে, ঐ যে কলার বনের আড়ালে আমাদের বাড়ী দেখা যায়, সন্ধ্যার পর সেইখানে অতিথি হইয়া যাইও, আমি নিজে রাঁধিয়া তোমাকে ভাত, ব্যঞ্জন ও দুধের ক্ষীর খাওয়াইব।

"খাইবা তুমি ভালমতে দিব আমি রাঁধি।
মায় বাপে রাজী হৈলে, হৈবে তখন সাদি॥"

ছোটকালের স্নেহ-বন্ধন এড়ান যায় না। তাহা আমের আঁঠার মত ছাড়াইতে চাহিলে ছাড়ান যায় না, তাহা নারিকেলের তৈলের মত, কোন ঋতুতে জমিয়া এককোণে পড়িয়া থাকে, কিন্তু রোদ পাইলে গলিয়া যে তৈল সেই তৈল হয়—উহা কোকিলের কুহুধ্বনির মত, থাকিয়া থাকিয়া কলিজাতে ঘা দেয়। ছোটকালের সুখ স্বপ্ন, তাহা ইহারা ভুলিতে পারে নাই। উভয়ের মনেই বর্ষার মত যৌবন ভাব-প্রবণতা আনিয়াছে। নূরন্নেহার মাতা-পিতা উভয়েই বুঝিয়াছেন, ইহারা পরস্পরের প্রতি অনুরাগী। সেইদিন সন্ধ্যাকালে

এই বহুদিনের বন্ধু নব অতিথিকে পাইয়া তাহারা সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

আহারের সময় আজগর' মিঞা ও মালেক সামনা-সামনি মুখ করিয়া বসিয়া কত গল্প করিতে লাগিলেন। নুরন্নেহা তখন ভাতের থালা লইয়া আসিল। সে আড়ে আড়ে মালেকের মুখখানি দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। 'বেতী' চালের চিকন ভাত তখনও গরম ছিল, তাহার উপর ধুঁয়া উড়িতেছিল, তাজা রিস্তা মাছের পেট ডিমে ভরা, অন্তমনস্কভাবে মালেক পাঁচ গণ্ডা রিস্তা খাইয়া ফেলিল।

"হাঁসের ডিম রেঁধেছে ভাল নুন মরিচে কড়া
পিঁয়াজ দিয়া ভুনি খিচুড়ী রাঁধিয়াছে বড়া।"

শেষ অঙ্ক পিষ্টকের। মালেক নুরন্নেহার হাতের রাঁন্না খাইয়া তৃপ্তি পাইল। "বহুৎ দিনের পরে পাইল সেই না হাতের পান।"

(৬) কালাপানিতে হার্ম্মাদ

রংদিয়ার পশ্চিমে অকূল অথৈ সমুদ্র। সেখানে ঢেউগুলি মল্ল যুদ্ধ করিতে করিতে এ উহাকে প্রহার করিতেছে। কত শত 'গধু' নৌকা ধান-চালে বোঝাই হইয়া এই সমুদ্র দিয়া চলিয়াছে! সিকতাভূমির বাঁকে হার্ম্মাদগণ (পর্ত্তুগীজ জলদস্যু) লুকাইয়া থাকে, তাহারা হঠাৎ গাঙচিলের মত এই সকল ব্যাপারী নৌকার

উপর আসিয়া পড়ে। তখন নৌকার মাঝিরা ভয়ে কাঁপিতে থাকে; বঙ্গসাগরের দক্ষিণ দিকে পাচগৈরা নামক ভীষণ আবর্ত্তশালী সমুদ্রের একটা স্থান আছে—তাহা পার হইলে আরও ভীষণ "কালাপানি।" সেথানে পাহাড়ের শৃঙ্গের মত ঢেউ ঝঞ্ঝার সঙ্গে দাপাদাপি করিয়া খেলায়,

"দম্‌কা হাওয়া ছোটে যখন দম্‌কা হাওয়া ছোটে,
"পাচগৈরার" বিষম ঢেউ আস্‌মান ছুঁইয়া ওঠে,
কালাপানি পার হৈতে বড় বিষম ঢেউ।
পীরের নামে হাজার টাকা সিন্নি মানে কেউ।
হিন্দু ডাকে জয়কালী মগে ডাকে ফরা।
এইবার প্রভু নিরঞ্জন শঙ্কটেতে তরা॥"

কালাপানি পার হইবার সময় পূবদিকে সারি সারি নূতন চরা দেখা যায়। এই সকল স্থানে দ্রুতগামী হার্ম্মাদের নৌকার আবির্ভাব দেখিলে ব্যাপারীর প্রাণ উড়িয়া যায়; হার্ম্মাদেরা কালাপানির মতই দুর্দ্দান্ত, তাহারা ভীষণ ঝড়ের মুখে সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। সমুদ্রের জলে পড়িয়া প্রাণ দিতেও তাহারা কোন তোয়াক্কা রাখে না, লুট-তরাজ করিয়া তাহারা ব্যাপারীর ডিঙ্গা ডুবাইয়া দিত, এবং মাঝি-মাল্লাগণকে বাঁধিয়া লইয়া যাইত। যখন তাঁহাদের বিদ্যুৎগতি দীর্ঘ ডিঙ্গাগুলি আসিতে দেখিত, তখন তাহাদের নিশান দেখিলেই ব্যাপারীরা ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িত।

এই হার্ম্মাদের দল একদা রংদিয়ার চরে আজগড় মিঞার বাড়ী

আক্রমণ করিল। এই অবস্থায় বিপন্ন আজগরের শক্তি লোপ পাইল, ডাকুরা তাহার লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ধনরত্ন সকলই লুটিয়া লইয়া গেল; নূরন্নেহা মাথা কুটিয়া কাঁদিতেছিল, তাহাকে পরমরূপবতী দেখিয়া তাহারা বাঁধিয়া ফেলিল এবং তরুণ মালেকের শরীরের গঠন ও মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহাকেও বাঁধিয়া লইয়া চলিল। হৃত-সর্ব্বস্ব আজগর ও তাহার শোকার্ত্তা স্ত্রী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। জীবনের দুঃখের নূতন অধ্যায়ে সে শৌর্য্যহীন ও আশা হারাইয়া "হায় আল্লা" বলিয়া পাগলের মত উর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিল। হার্ম্মাদগণের নৌকা চিলের মত উড়িয়া উড়িয়া চলিল; একটা ডিঙ্গার মধ্য-ঘরে নূরন্নেহাকে হাত পা বাঁধিয়া শোয়াইয়া রাখিয়াছিল, সে একেবারে বেপরদা, তাহার শরীর প্রায় নগ্ন,—তাহার দীঘল চুলগুলি এলাইয়া পড়িয়াছে, বাতাস সেই চুলগুলি লইয়া তাহাকে বিব্রত করিতেছে, তাহার পাশেই মালেকের হাত দুটি পিছ-মোড়া করিয়া বাঁধা। সেই বাঁধন এত শক্ত যে সে বেদনায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে,—এমন সময় ডাকুদের একজন সেখানে আসিয়া নূরন্নেহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মালেকের দিকে চাহিয়া বলিল,—

"ছুরৎ বড় বাহারে কন্যার তোর হয়রে কি ?
কোন্ দেশে শ্বশুরের ঘর, কোন্ বাপের ঝি ?"

মালেক চাহিয়া রহিল, তাহার মুখে কোন উত্তর ফুটিল না। ক্রুদ্ধ ডাকুর সর্দ্দার একখানা দা লইয়া তাহাকে কাটিতে উদ্যত হইল।

নূরন্নেহা চীৎকার করিয়া 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এমন সময় সহসা বাতাস প্রবলবেগে বহিয়া পালের দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং নৌকাখানাকে সবলে একটা স্রোতের ঘূর্ণীপাকের মধ্যে ফেলিল, নৌকা চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে তলাইয়া যাওয়ার মধ্যে হইল,—কিন্তু ডুবিল না;—হঠাৎ ভাগ্যবশে একটা বালুর চরায় আসিয়া ঠেকিল।

(৭) জেলেদের কাণ্ড

সেইখানে কয়েকজন জেলে মাছ ধরিতেছিল, তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে সিন্দুর মাখাইয়া অস্তাচলে ডুবিতেছিলেন। ডাকুরা নিজ ডিঙ্গা ছাড়িয়া জেলেদের ডিঙ্গায় আসিয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। সেই সময় জেলেদের কেহ ভাত রাঁধিবার জন্য আগুন জ্বালিতেছিল, কেহ মাছ কুটিতেছিল। ডাকুরা তাহাদের নৌকায় ঢুকিলে ক্ষণকালের জন্য তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই কেহ লগি, কেহ নৌকার হাল, কেহ বাঁশ লইয়া হার্ম্মাদদিগকে আক্রমণ করিল। সেই ধূ ধূ বালুর চরায় কাহারও মাথা ফাটিয়া গেল—কেহ প্রাণত্যাগ করিল। জেলেদের মধ্যে একটি অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ছিল, তাহার উপদেশে কয়েকজন জেলে যাইয়া প্রচুর পরিমাণে লঙ্কার গুড়া লইয়া আসিল। হার্ম্মাদের পেছন দিকে যাইয়া তাহারা তাহদের চোখে মুঠো মুঠো সেই লঙ্কার গুঁড়া নিক্ষেপ করিল। তীব্র জ্বালায় তাহারা প্রায় অন্ধ হইয়া নিজ নৌকায়

পলায়ন করিতে উদ্যত হওয়ার সময় সেই দৃষ্টিহীন হার্ম্মাদদিগকে জেলেরা অনায়াসে বাঁধিয়া ফেলিল।

জেলেদের কেহ বলিল, "ইহাদিগের মাথা ভাঙ্গিয়া এখুনি সমুদ্রের জলে ফেলান হউক," কেহ বলিল "গলায় পাথর বাঁধিয়া দরিয়ায় ডুবাইয়া দেওয়া যাক্।" এই বাক্‌বিতণ্ডার সময় হার্ম্মাদের নৌকা হইতে মালেকের উচ্চ বিলাপধ্বনি শুনিয়া জেলেরা হস্তপদ বদ্ধ মালেককে সমুদ্রের পারে লইয়া আসিল এবং দেখিল সেইখানে কাঞ্চন প্রতিমার মত এক সুন্দরী রমণী হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহার দাঁতি লাগিয়াছে, চক্ষু উল্টিয়া আছে, প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায় না, নাড়ীও টের পাওয়া গেল না।

অত্যন্ত সতর্কতার সহিত জেলেরা নূরন্নেহাকে ধরিয়া তাহাদের ডিঙ্গায় উঠাইল, তাহার এই অবস্থা দেখিয়া মালেক চীৎকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল,

"কেহ দেয় মাথায় পানি, বাতাস করে গাও
মালেক বলিল, বহিন আমার দিকে চাও।
গা তোল গা তোল বহিন, উঠ একবার
রাংদিয়ার চরেতে চল যাই পুনর্ব্বার।
উঠরে উঠরে আমার পুন্নমাসীর চান্দ।
কে আর আদরে দিবে হাতে খিলি পান॥"

কে আমাকে তেমন যত্নে খাইতে দিবে, কাছে বসিয়া গল্প করিবে, নূতন হাঁড়ীতে দৈ পাতিবে এবং গ্রীষ্মকালে শীতল সরবৎ খাওয়াইয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করিবে।

নূরন্নেহা

"গা তোল, গা তোল আমার আঁধার ঘরের বাতি।
কে আর গো দিবে আমায় শীতল পাটি পাতি।"

এক বৃদ্ধ জেলে বায়ুরোগের বড়ি আনিয়া চাল ধোওয়া জল দিয়া নূরন্নেহাকে খাওয়াইয়া দিল, চোখে জলের ঝাপ্টা দিল এবং ঝিনুকে করিয়া ডাবের জল খাওয়াইল।

এদিকে বন্দীদের সেবা-শুশ্রূষার গোলমালে ডাকুরা সুবিধা পাইল; তাহাদের একজন তাহার বাঁধন দাঁতে কাটিয়া অপর সকলের বাঁধন খুলিয়া দিল, তাহারা এই ভাবে মুক্তি পাইয়া নিজেদের ডিঙ্গিতে যাইয়া দ্রুতবেগে সমুদ্র পথে পালাইয়া গেল।

এদিকে সেই বালুর চরের উপর পাতার ছাউনি কুঁড়ে ঘরে জেলেরা নূরন্নেহাকে লইয়া আসিল, বহু শুশ্রূষার ফলে মনে হইল, নূরন্নেহার নিশ্বাস পড়িতেছে। যখন অর্দ্ধরাত্রে আকাশে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, দক্ষিণা বাতাসে নূরন্নেহা যেন পাশ ফিরিয়া শুইতে চেষ্টা করিল এবং একটুখানি সময়ের জন্য দুটি চোখ একবার মেলিয়া পুনরায় বুজিল। হাতে বিজনী লইয়া স্বীয় অঙ্কে নূরন্নেহার মস্তক রাখিয়া মালেক তাহাকে হাওয়া করিতেছে। শেষ রাত্রে কুমারী কতকটা সুস্থ হইয়া বাড়ী-ঘরের অবস্থা মালেককে জিজ্ঞাসা করিল। জেলেরা পরদিন প্রাতে তাহাকে সরু চালের ভাত কচ্‌লাইয়া নেবুর রস দিয়া খাওয়াইতে চেষ্টা করিল। ক্রমে সে ভাল হইয়া উঠিল। সমুদ্রের পারে পাতার বেড়া ও পাতার ছাউনী কুটিরে তাহারা পরস্পরকে যেন হারাইয়া পুনঃ প্রাপ্তির আনন্দ অনুভব করিল।

"মাছে যেন পাইল পানি, পানিতে পাইল গাঙ্গ।
লাউ ঝিঙার লতা যেন পাইল বাঁশের চাঙ্গ।"

তাহারা ক্ষণকালের জন্য তেমনই মিলন-সুখ উপভোগ করিল।

জেলেরা ইহার পরে শুকনা মাছ বোঝাই করিয়া বড় বড় 'গধু' নৌকা লইয়া সমুদ্রের পথে যাত্রা করিল। পাল খাটাইয়া অনুকূল বাতাসে মহানন্দে তাঁহারা সারি গাহিয়া চলিল।

"কেহ বাজায় বাঁশের বাঁশী কেহ বাজায় শিঙা।
নাচিতে নাচিতে চলে ধান বোঝাই ডিঙ্গা।"

তাহারা সারি গান গাহিতে গাহিতে চলিল। সে গানের মর্ম্ম এইরূপ,—

"পৌষ মাসের শীত, সাঁতারাইয়া আমরা "ঢেইয়া" জাল দিয়া সমুদ্রের মাছ ধরিলাম। জালে প্রচুর চিংড়ি, বেলে, কোড়াল ও বোয়াল মাছ পড়িল।

রাত্রিতে 'বেইন' জাল ফেলিলাম, খাওয়া-দাওয়া করিতে দেরী হইয়া গেল। 'ধান-চিরণ্যা' ও 'আস্তাব' চরা—মাছের ঘর-বাড়ী বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। কতক মাছ জালে পড়িল, কতকগুলি ছুটিয়া পলাইল, অনেকগুলি ধরা পড়িল এবং কতকগুলি জাল হইতে লাফাইয়া জলে পড়িল। তারপর আমরা 'লাফ দিয়া' চরে গেলাম —সেখানটা ঝড় হইলে বড় বিপদে পড়তে হয়। কিন্তু সেখানে অসংখ্য মাছ, সোন্যাদিয়ার উত্তর বাঁকে ছুরি, বাইলা ও কাইস্যা মাছ সমুদ্রের উপর ভাসিয়া বেড়ায় কিন্তু 'ছুরি' মাছগুলি খুব বড়,

তারা হুড়াহুড়ি করিয়া জালে আসিয়া পড়ে এবং কতকগুলি জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে।”

তিনদিন পরে জেলেরা রংদিয়ার চরায় পৌঁছিল। কন্যাকে লইয়া মালেক আজগরের হাতে অর্পণ করিল। আজগর কন্যাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার মাতা তাহাকে বুকে লইয়া মুখে বারংবার চুমো খাইতে লাগিলেন।

গাঙ সাঁতারি তারা যেন পাইল কূলের মাটী
অন্ধ যেন হাতড়াইয়া পাইল তার লাঠি।”

(৮) রহস্য-ভেদ

নূরন্নেহা ও মালেকের ভাব-গতিক দেখিয়া পিতা-মাতা বুঝিলেন, ইহারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। মালেক সেদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া আজগরের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলিল। বেড়ার ফাঁকে নূরন্নেহা বারংবার সেই কথাবার্ত্তার দিকে কান পাতিয়া রহিল। কিন্তু মালেককে এত আদর ও স্নেহের কথা বলিয়াও আজগার তাহাদের বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না। উভয়ে এজন্য চিন্তিত ও বিস্মিত হইল। আহারের পরে আজগর রোজই কতকটা সময় মালেকের সঙ্গে ব্যয় করে; কিন্তু বিবাহের কথা একবার আভাষেও বলে না।

একদিন সন্ধ্যাকালে আজগর মিঞা মালেককে লইয়া সমুদ্র-তীরে বেড়াইতে গেল, এবং অতি গম্ভীর ভাবে তাহাকে একটি কথা

বলিল। সে তাহাকে স্নেহার্দ্রভাবে কহিল, "মালেক, তুমি প্রকৃতই আমার পুত্র-তুল্য। আমার জীবন যতদিন, ততদিন তোমাকে আমার চোখে চোখে রাখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তুমি নূরন্নেহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, আমাদের ধর্ম্মের সরা মতে, তোমাদের বিবাহ সিদ্ধ হয়না।"

"অনেক পূর্ব্বের কথা তাহা তুমি জাননা, কেউ তোমাকে বলে নাই। কিন্তু আজ সেই অতীতকালের কতকগুলি ঘটনা বলিব, তাহাতে তুমি সকলই বুঝিতে পারিবে।

"তোমার বাবা নজু মিঞার বিবাহ খুব ধুমধামের সহিত হইয়াছিল, কিন্তু কোন দুষ্ট লোক তোমার মায়ের নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়া নজু মিঞার মন ভাঙ্গাইয়া দিল। এ বিষয়ে নিরপরাধ আমি —কোন দোষের দোষী না হইয়াও তোমার পিতার বিরাগের ভাজন হইলাম। তোমার মায়ের সঙ্গে তোমার পিতার মনের ভাব ক্রমশ বিরূপ হইয়া চলিল, অবশেষে তোমার জন্মের পর নজু মিঞা বিশুদ্ধ চরিত্রা তোমার মাতাকে মিথ্যা সন্দেহে তালাক দিলেন।

"তোমার মা অসহায় ও আশ্রয়হীন হইয়া নিজের বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইলেন এবং পরে আমার নিকট আসিয়া চোখের জল ফেলিয়া গদগদ কণ্ঠে তাঁহার যত দুঃখের কথা কহিলেন। তাহাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ জানিয়া আমি তাহাকে নিকাসূত্রে বিবাহ করিলাম।

"সে যে কি এক দুঃখের দিন গিয়াছে তাহা আর কি বলিব! প্রতিবাসীরা আমাকে দোষী ঠাওরাইল ও সর্ব্ববিষয়ে আমার

প্রতিকূলতা করিল। আমার কারবার বন্ধ হইয়া গেল, আমার হাতে একটা কড়ি ছিলনা, ঘরে একমুষ্টি চাল ছিলনা।

"যত দুঃখ পাইলাম আমি কি কহিব আর।
আগুনের মাঝে পানি তোমার মা আমার।"

এই দুঃসময়ে আমার প্রাণের পুত্তলী, কলিজার হাড়—নূরন্নেহা জন্মিয়া আমার ঘর আলোকিত করিল। সুতরাং নূরন্নেহা তোমার সহোদরা, মায়ের পেটের ভগিনী, তাহার সহিত তোমার বিবাহ হইতে পারে না।"

"দেবাঙ্গ অঞ্চলে আমার বাস অসম্ভব হইয়া পড়িল, সকলেই আমার শত্রু। সুতরাং আমি বাপের ভিটা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।"

বজ্রাহতের ন্যায় মালেক এই কাহিনী শুনিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার পায়ের তলায় মাটি কাঁপিয়া উঠিল, আসমান যেন সেইখানে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

আজগর মিঞা বলিল, "এখন রাত হয়েছে, চল ঘরে যাই।" অন্যমনস্কভাবে মালেক উত্তর করিল, "আপনি যান, আমি একটু পরে যাইতেছি।" বৃদ্ধ আজগর মিঞা মালেকের মনের গভীর বেদনা ততটা বুঝিতে পারিল না, তথাপি আর একবার বলিল—"দে'খ, যেন দেরী না হয়।"

কিন্তু নূরন্নেহা রাঁধিতে বসিয়াছিল। এই সময় অহেতুকী আশঙ্কায় তাহার মনটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল। রান্না শেষ হইল,

পিতা খাইলেন, মাতা খাইলেন, ভাতের থালা সামনে করিয়া নূরন্নেহা মালেকের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল, শালি ধানের ভাত ঠাণ্ডা হইয়া গেল, সামুদ্রিক মাছের ঝোল জুড়াইয়া গেল। দুর্ভাবনার শেষ নাই। মাঝে মাঝে নূরন্নেহার চোখ ঘুমের ঘোরে বুজিয়া আসে এবং সে ঢুলিয়া পড়ে। মধ্যরাত্রে নূরন্নেহা পিতাকে যাইয়া বলিল, "মালেক তো এখনো আসিল না, বাবা।" এইবার বৃদ্ধের সত্যই ভয় হইল; সে একটা মশাল জ্বালাইয়া সারা পল্লীটি খুঁজিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া মালেককে প্রতি ঘরে, বাজারে ও ঘাটে ডাকিয়া সাড়া পাইল না। সারারাত্রি খুঁজিয়া প্রাতে বিশুষ্কমুখে সে বাড়ী ফিরিল, দেখিল নূরন্নেহার দুটি চক্ষু কাঁদিয়া রক্তজবার ন্যায় লাল হইয়া আছে।

(৯) শেষ

সেই রাত্রে মালেক অস্থির চিত্তে ঘাটের কাছে আসিয়া দেখিল, একখানি বালাম নৌকা আসিতেছে, সে মাল্লা গিরি কাজ লইয়া সেই নৌকায় চড়িল। বালাম নৌকা তাহাকে লইয়া উত্তরমুখে চলিয়া গেল।

সুখ-দুঃখ লইয়া মানুষের জীবন পদ্ম-পত্রের উপরে জলবিন্দুর ন্যায় সংসারে টলমল করিতেছে, কে মানুষের ভাগ্যচক্র আবর্ত্তন করেন, এত প্রাণের পিপাসার সৃষ্টি করিয়া মুখের কাছে পান-পাত্র দিয়াও তাহা খাইতে দেন না! হাতে রত্ন দিয়া হাত হইতে রত্ন

কাড়িয় নেন। নূরন্নেহা দিন রাত্রি কাঁদে ও নদীর দিকে তাকাইয়া থাকে, কাহার পদশব্দ শুনিবার জন্য সদাসর্ব্বদা তাহার প্রাণ দুরু দুরু করিয়া উঠে।

সেই অঞ্চলে সেবার বসন্তের পীড়া, খুব বেশী হইল, মাতা পিতা মরিলেন, চতুর্থ দিনে নূরন্নেহার গায় গুটি দেখা দিল, সে শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, কে তাহাকে দেখিবে! কে তাহার তৃষ্ণার্থ-ঠোঁটে একফোঁটা জল দিবে! কাহার পাদক্ষেপ প্রত্যাশা করিয়া সে চোখদুটি জানেলার দিকে রাখিয়া কাঁদিতে থাকে, হায়! সে আসিবে না,—এজীবনে মালেকের সঙ্গে আর দেখা হইবে না!

বাড়ীর তিনটি প্রাণী সাতদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

পাঁচ বৎসর পরে মালেক বাড়ী ফিরিয়াছে। সে মস্তবড় বণিক হইয়া অনেক ধনরত্ন লইয়া ষোল দাঁড়ের নৌকা চালাইয়া রংদিয়া চরায় আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার নৌকায় রংবিরঙ্গের কাপড়ের পাল উড়িতেছে। অনেক লোক সেই নবাগতকে দেখিবার জন্য সমুদ্রতটে ভিড় করিয়াছে। বণিক এদিকে চাহিল না—সেদিকে চাহিল না, সোজা আজগর মিঞার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ভিটা পড়িয়া আছে, জনপ্রাণী নাই। একদিকে একটা বাদুড় উড়িয়া গেল, আর এক দিক দিয়া একটা শেয়াল গর্ত্ত হইতে উঠিয়া বামদিকে চলিয়া গেল।

মালেক সেই ভিটায় পড়িয়া রহিলেন, লোক-জনেরা আজগর,

তাহার কন্যা ও স্ত্রীর কবর সাগরের তটে দেখাইয়া দিল। তাহার একটার উপর মালেক সারারাত পড়িয়া রহিলেন; কবরের শ্যাম শষ্প ও নব দূর্ব্বাদল জন্মিয়াছিল, তাহা তার অশ্রুতে ভিজিয়া গেল। শেষ রাত্রে মালেক স্পষ্ট শুনিলেন, কে কবর হইতে কথা বলিতেছে, তাহা এত মৃদু যে কানে পৌঁছিল কি না সন্দেহ, তাহা এত মিষ্ট যে তাহার হৃদয়ের সমস্তগুলি তার যেন সেই সুরে বাজিয়া উঠিল। অশরীরী নুরন্নেহার বাণী এই—'ভাই মালেক, আমি তোমায় ভুলি নাই, জীবনে মরণে কখনও ভুলিব না। আমার দেহে অস্থি-মাংস নাই, কিন্তু প্রাণে ভালবাসা আছে—ভালবাসা মরে না, দেহের মত তাহা ধ্বংসশীল নহে। আমি তোমার চিন্তা কিছুতেই এড়াইতে পারি নাই—দিন-রাত আমার মন তোমাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।" কবরের এই বাণী শুনিয়া মালেকের মুখ একটা বিশীর্ণ পদ্মের মত চোখের জলে ভাসিতে লাগিল

"এক দুই দিন করি চার দিন যায়
চোখের পানিতে মালেক কবর ভিজায়।
ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুর তার নাইক মালুম,
অনড় পড়িয়া আছে চোখে নাই ঘুম॥
দাঁড়ি মাঝি আসি সবে কৈল্ল টানাটানি।
না খাইল দানারে, আর না খাইল পানি॥
ষোল দাঁড়ের বালাম নৌকা নয়া নূতন পাল
নানান দেশের বেশাতি আর নানারকম মাল॥

নূরন্নেছা

ফিরিয়া না চাইল মালেক, না চাহিল ফিরি।
কোথায় গেল ধন-দৌলত কোথায় মিঞা গিরি ॥
পশ্চিম সাগরের মাঝে উজান ভাটি বাহি।
মাঝি মাল্লা যায় সদা গাঙ্গে বাহি সারি গাহি ॥
চাহিয়া থাকে পাগল মালেক চাহিয়া দেখে দূরে।
আবার কখনও কবরের চারদিকেতে ঘুরে

এই বিরহ, এই দুঃখের শেষ নাই।

মালেক—"কি এক ভাবনা ভাবে মুখে নাইরে বাত।
ছেঁড়া কাপড় ছেঁড়া কুর্ত্তা, টুপি নাই মাথাত।

আয়না বিবি

(১) মামুদ উজ্জালের সফর

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, ভেরা-ময়না নদীর তীরে চাঁদ সদাগরের বিশাল ভগ্ন প্রাসাদগুলি তখনও দেখা যাইত। তাঁহার বংশের এক শাখা শিবের স'লতের ন্যায় সেই বিপুল প্রাসাদের কয়েকটি প্রকোষ্ঠ লইয়া বাস করিত। বহু শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, সদাগরের যে সকল বাণিজ্য-পোত আকাশ-চুম্বী, হীরা-মণি-জড়িত সোনার মাস্তুল লইয়া স্বর্ণ-পক্ষ নভশ্চর পাখীর ন্যায় অকূল সমুদ্রের বক্ষে উড়িয়া বেড়াইত ও দিক্ দিগন্ত হইতে ধন-রত্ন লুটিয়া এই বাঙ্গলা দেশকে সমৃদ্ধ করিত, সেই বিস্তৃত বাণিজ্যের কথা মাত্র তখন অবশিষ্ট নাই। তাঁহার বংশের যে শাখাটি পূর্ব্ব পুরুষের ভিটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিল, তাহারা কালক্রমে ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেই থানেই রহিয়া গেল।

নানারূপ অবস্থান্তর হইলেও সেই গৃহের কয়েকটি প্রকোষ্ঠে সাঁঝের বাতি জ্বলিত। গৃহ-সন্নিহিত ভেরামরনা নদীতে এখনও কয়েকখানি জল-যান সারা বৎসর লোক-লোচনে বহির্ভূত হইয়া থাকিত; কখনও কখনও গৃহ স্বামীর আদেশে তাহা তুলিয়া উঠান হইত, তাহাদের তক্তা মেরামত হইত, সুঁদি বেতে পাটাতনগুলি পুনরায় দৃঢ়ভাবে আটখান হইত এবং তাহাদের রং ফিরাইয়া

মালিকের আদেশ-ক্রমে বাণিজ্য যাইবার জন্য প্রস্তুত করা হইত। সেই বংশের মামুদ উজ্জাল নামক এক তরুণ বণিকের ডিঙ্গাগুলি সজ ও মসল্লা বোঝাই করিয়া একদা ভেরাময়না বাহিয়া 'শিবের বাঁক' অতিক্রম পূর্ব্বক এক বিশাল নদীপথে চলিতে লাগিল। মামুদ উজ্জালের সঙ্গে তাঁহার এক অংশীর দার ছিলেন। বহু দিন গত হইল বিখ্যাত একটি বন্দরে যাওয়ার পথে তাহারা একটা দুরন্ত নদীর দূর-প্রসারিত বালুর চর দেখিতে পাইল। অংশীদার বলিল, "মামুদ ভাই, আজ রাত্রে এইখানে ডিঙ্গাগুলি বাঁধা থাক, ঐ দেখ পশ্চিম দিক্ মণ্ডল্ ঘোর কৃষ্ণ মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, বায়ু যেন ক্ষুব্ধ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া আছে; হয়ত ইহা একটি ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। শুনিয়াছি এই বিস্তৃত বালুচরে দস্যু ও ঠেঙ্গাড়া গণ বাস করে, আর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ নহে। মামুদ উজ্জাল অংশীদারের পরামর্শ মানিয়া লইল এবং তাহাদের আদেশে নদীতীরের এক প্রাচীন সুদৃঢ় হিজলবৃক্ষের মূলে দড়ি-কাছি বাঁধিয়া সেই স্থানে ডিঙ্গাগুলির নঙ্গর করা হইল।

রাত্রে আগুনের অভাব হওয়াতে সেই বালুর চরের এক নিভৃত প্রান্তে একটা খড়ের কুঁড়ে ঘরে তরুণ বণিক পদব্রজে চলিয়া আসিলেন।

একটি সৌম্য-দর্শন বৃদ্ধ দাওয়ার উপরে বিমনা হইয়া বসিয়াছিলেন, তিনি মামুদ উজ্জালকে ডাকিয়া একটা মোড়ার উপরে বসাইয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন, এককালে আমার অবস্থা ভাল ছিল, এখন বিপন্ন

হইয়া পড়িয়াছি। আমার বিস্তর জমি ও তালুক 'শিবের বাঁকে' জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। এখন সামান্য একটুকু জমি আছে, তাহাতে আমাদের কায় কষ্টে এক বেলার সংস্থান হয়—অপবাহ্নে প্রায়ই উপবাসী থাকি। আমি ও আমার চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যা— আমরা মাত্র দুটি প্রাণী আছি। মেয়েটি জল আনিতে নদীর ঘাটে গিয়াছে, এখনই আসিবে। সে আপনাকে কাষ্ঠ ও আগুনের জোগাড় করিয়া দিবে" এই কথা বলিতে বলিতে দেখা গেল, তাহার কন্যাটি দ্রুত গতি মন্থর করিয়া অপরিচিতের আগমনে যেন লজ্জিত হইয়া নিম্নের দিকে দৃষ্টি নত করিয়া আছে—কলসী কক্ষে সে দ্বারের এক কোণে দাঁড়াইয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃত্তিকা খুঁড়িতেছে। এই চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা চতুর্দ্দশীর চাঁদের মত, তাহার নাম আয়না; মামুদের মনে হইল, লজ্জাবগুণ্ঠিতা এমন সুন্দরী কিশোরী সে সংসারে অন্য কোথায়ও দেখে নাই। আয়নাও তাহার সলজ্জ দৃষ্টির কোণে মামুদের যে মুখ খানি দেখিল, তাহা তাহার মনে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া গেল। কোন কথাবার্ত্তা নাই, দৃষ্টি-বিনিময় সেই একবার ছাড়া আর হয় নাই—তথাপি যেন হৃদয়ের শেষ বিকি কিনি হইয়া গেল,—উভয়ে উভয়কে প্রাণ সমর্পণ করিয়া ফেলিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার দিন শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন মেয়েটিকে কোথায় কাহার কাছে রাখিয়া মরিব, সেই ভাবনায় আমার ঘুম হয় না," বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষের কোণে এক ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল;—"এ মেয়ের বিবাহের বয়স হইয়াছে, কাহার সঙ্গেই বা বিবাহ দিব, এবং কেই বা ইহার

ভার লইবে!" এই কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার গদ্‌গদ কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

আরো কতকদূর আলাপের পর, জানা গেল—মামুদ উজ্জালের পিতা এই বৃদ্ধের বন্ধু ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ছিল। প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে মামুদ স্বীয় ডিঙ্গিতে ফিরিবার সময় উৎকন্ঠিত ভাবে বৃদ্ধটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তুমি বাছা ফিরিবার পথে একবার আমাদের খোঁজ লইয়া যাইও, আমার দেহ ক্রমেই অশক্ত ও অসাড় হইয়া পড়িতেছে, তোমার সঙ্গে আর দেখা হইবে কি না—জানি না।" তরুণ বণিক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া নৌকায় ফিরিলেন, কিন্তু বেড়ার ফাঁকে আয়না যুবকের গতির দিকে দুইটি কালো চোখের দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিল; মামুদ তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু হৃদয়ে সেই স্থানটির প্রতি গাঢ় অনুরাগ অনুভব করিলেন। যৌবন কালের প্রথম প্রেম—তাহা যে স্থানে প্রথম অঙ্কুরিত হয়—তাহা তীর্থের মত পবিত্র।

নৌকা উজান বাহিয়া আর পাঁচ বাঁক পূবের দিকে ছুটিল। পূর্ব্ব-দেশীয় হাওয়া মামুদের সহ্য হইল না, সে জ্বরে পড়িল। অংশীদার দেখিতে পাইল, পীড়িত মামুদ বিকারের ঘোরে কি যেন বলিতে থাকে; বালুর চরে সে পরী দেখিয়াছে, সে পরী তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে।

জ্বরের ঘোরে মামুদ যে দিকে দৃষ্টি পাত করে সেই দিকে দেখে আয়না বিবি দাঁড়াইয়া আছে, চক্ষু বুজিলে সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তাহার

মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া তাঁহাকে পাগল করিয়া তোলে। মামুদ একটু ভাল হইয়া ভাগীদারকে বলিল, "যাহা কিছু মাল আছে, তাহা এখানেই বেসাতি করিয়া যাওয়া যা'ক—আরও পূবের দিকে গেলে আর আমার জীবন থাকিবে না, এই হাওয়া আমার বরদাস্ত হইবে না।"

ভাগীদার ভাবিল, মামুদ পাগল হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র বন্দরে পৌছিয়া সে সমস্ত মাল সস্তা দরে বেচিয়া ফেলিল। এই ভাবে সে লোকসান দিয়া বাড়ীর দিকে ডিঙ্গা চালাইয়া দিল।

বালুর চরে আসিয়া সে নৌকা থামাইল, সেই হিজল গাছটির সঙ্গে নৌকায় দড়ি বাঁধিয়া নৌকার নঙ্গর করিয়া--সেই কুঁড়ে ঘরের খোঁজে রওনা হইল।

একবারে নিশ্চিহ্ন। সে কুঁড়ে ঘরের একটি ভাঙ্গা বেড়া—একটি বাঁশও নাই। আশে পাশে লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল--পিতার মৃত্যুর পর আয়না কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন খোঁজ তাহারা জানে না। পিতার কবরে জানজা পড়ার পর--আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে সে অন্তের অগোচরে যে দিকে দৃষ্টি যায়, সেই দিকে চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ তাহাকে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সুন্দরী যেন তাঁহাদের বাহ্যিক সহানুভূতির মধ্যে কোন দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিয়া তাহাদের কথায় কর্ণপাত করে নাই।

নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া সজল-চক্ষে মামুদ ভাগিদারকে বলিল—"তোমরা আমার দুঃখিনী মাতাকে প্রবোধ দিও, বলিও,

মামুদ তাহার মাথার মাণিকটি হারাইয়া রাজ্যময় তাহা খুঁজিতে গিয়াছে, বাঘে খাইলে বা সাপে দংশন করিলে সে কোন জঙ্গলের পথে পড়িয়া থাকিবে, নদী পার হইবার সময় হয়তঃ ডুবিয়া মরিবে, কিন্তু সে যে পর্য্যন্ত তাহার হারানো মাণিক না পায়—সে পর্য্যন্ত নিজের বাড়ীতে ফিরিবে না।"

কোন বাধা বা পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া মামুদ পাগলের মত ফকিরী বেশ ধরিয়া ছুটিয়া পলাইল। ভাগীদার বা নৌকার মাঝি-মাল্লা কেহ তাহার খোঁজ পাইল না।

সে ফকিরের বেশ ধরিয়া এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গৃহস্থের ঘরে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ভিক্ষা ভাণ মাত্র, সে আয়নাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ছুটিয়াছে; সমুদ্রের দিকে যেন পাহাড়িয়া স্রোত ছুটিয়াছে,—কে তাহার গতিরোধ করিবে?

কোন গৃহস্থের প্রৌঢ়া রমণী দুঃখ করিয়া বলেন, "এমন কচি বয়স, এমন অপরূপ রূপ, ইহার মাতা কোন্ প্রাণে ইহাকে ছাড়িয়া আছেন?" প্রৌঢ়া ঝুলি ভরিয়া ভিক্ষা দেন; পথে যাইতে ঝুলি হইতে তাহার অর্দ্ধেক পড়িয়া যায়—মামুদ বেহুঁসের মত চলিয়াছে—সে তাহা দেখিতে পায় না।

বধূ ভিক্ষা দিতে বাহিরে আসিলে শাশুড়ী বারণ করিয়া বলেন "এ ফকিরের চাউনি সুন্দর, কথা মধুর—এ ছেলেটি মনে কোন নিদারুণ আঘাত পাইয়া কপট ফকির সাজিয়াছে।" তাহার এ বয়সে ফকিরবৃত্তি অবলম্বন সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলে, কেহ বলে—কারণ আছে, কেহ বলে কোন কারণই নাই।

ছয়মাস গেল, আয়নার কোন খোঁজই মিলিলনা। সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ চুলগুলিতে জট বাঁধিয়া গিয়াছে, মুখখানি হৈমন্তিক পদ্মের মত ছিল, তাহা যেন শীতের প্রকোপে শুকাইয়া গিয়াছে। একদা সারাদিন সে কিছু খায় নাই, সন্ধ্যাকালে অনির্দ্দিষ্ট পল্লী-পথে চলিয়াছে, দূরে ঘন বাঁশের আড়াল হইতে রান্নাশালার ধোঁয়া উঠিতেছে,— সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মি আম-গাছগুলির মাথার উপর ঝিলিমিলি করিতেছে, দূর দূরান্তরের নভস্তল পর্য্যটন করিয়া কাক, শালিক, টিয়া প্রভৃতি পাখী গ্রামের তরুগুলির কুলায়ের দিকে ছুটিতেছে, তাহাদের কলরবে আকাশ মুখরিত হইতেছে। ক্রমে সূর্য্যাস্তের শেষ আলো পৃথিবী হইতে চলিয়া গেল, ফকির আর পল্লী পথ দেখিতে পাইল না; একটি পর্ণ-কুটিরের নিকটে আসিয়া অভ্যস্তভাবে জিকির ছাড়িয়া ভিক্ষার জন্ম দাঁড়াইল। এক সুন্দরী কুমারী ভিক্ষা লইয়া আসিয়া মামুদের দিকে চাহিল, তাহার হাতের ভিক্ষার পাত্র মাটিতে পড়িয়া গেল। আয়না একবার কিছুক্ষণের জন্ম যাহাকে দেখিয়াছিল, তাহার মনের আয়নায় তাহা স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত আছে, সে কি তাহা ভুলিতে পারে?

উভয়ে উভয়কে চিনিল—মামুদ তাহাকে তাহার এই ছয় মাস ব্যাপী ভ্রমণের ইতিহাস বলিল, সে তাহার জন্ম কত কষ্ট সহিয়াছে, সংক্ষেপে তাহার বিবৃতি দিল। যাহা কথায় বলা হইল না, আয়না তাহা মামুদের চেহারা দেখিয়া বুঝিলেন। আয়না বলিল, "বাবাজানের মৃত্যুর পর এই দূর গ্রামে তাহার মামাবাড়ীতে সে চলিয়া আসিয়াছে, তদবধি এই স্থানেই আছে। এক মামাত

ভাই তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে, সে তাহাতে রাজী হয় নাই ;—এজন্য তাহার উপর ঘোর পীড়ন চলিতেছে। "এখানে আর একদণ্ডও প্রতীক্ষা করার দরকার নাই, চল, আমরা এখুনই চলিয়া যাই, তোমাকে ছাড়া আমি কিছুতেই থাকিতে পারিব না।"

দীর্ঘদিনের পর আয়নাকে লইয়া মামুদ স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। উভয়ের মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মা তাঁহার বুকের হারাণো ধন পাইয়া জুড়াইয়াছেন।

(২) কিছুকালের জন্য সুখের সংসার

উজ্জাল সাধু বাজারে যায়। আয়না কানে কানে বলিয়া দেয়, "আমার জন্য একখানি আঁবের চিরুণী কিনিয়া আনিও," কোণাকুণী পথ ধরিয়া মামুদ হাটের পথে যাওয়ার সময়—আয়না জানালা দিয়া তাহাকে ইসারা করে, সে ফিরিয়া আসিলে আয়না তাহার জন্য "নাক-বলাক" নথ আনিতে আবদার করিয়া অনুরোধ জানায়। মামুদ বলে "তোমার জন্য নানা ফুল-থি[illegible] আসমানতারা শাড়ী আনিব, তুমি তাহা পরিয়া নদীর ঘাটে [illegible]ন আনিতে যাইবে, আমি তোমার গতি-ভঙ্গী ও সেই শাড়ীর প্রভাবে ঝলমল মূর্ত্তিখানি দেখিবার জন্য পথের এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকিব।"

মামুদউজ্জাল বাজার হইতে কত গন্ধ তৈল কিনিয়া আনে, সেই

গন্ধ তৈল মাখাইয়া যখন আর্দ্র বস্ত্র ছাড়িয়া সে নূতন নীলাম্বরী পরে, তখন সদাগরের মাতা ও ভগ্নী দেখেন সত্য সত্যই তাহাদের ঘরে যেন রূপের প্রদীপ জ্বলিতেছে। বউকে পাইয়া তাঁহারা উভয়ে খুসী এবং মামুদের তো খুসির অন্ত নাই।

(৩) "প্রতিপদ চন্দ উদয়ে যৈছে যামিনী— সুখনব ভৈগেয় নিরাশা"

আবার জ্যৈষ্ঠ মাস আসিল,—গাঙ্গ নূতন জলে ভর্ত্তি হইয়া গেল। নভশ্চর পাখীরা জলের উপর কলরব করিতে লাগিল শত শত বাণিজ্য পোত নদী-স্রোতে হাঙ্গর-কুমীরের মত ভাসিতে লাগিল— ভাগীদার মামুদের ডিঙ্গাগুলি জল হইতে উঠাইয়া নূতন কাঠে বাটাম মারিল, নূতন সুদর্শন রংবিরং বস্ত্র আনিয়া নূতন পাল খাটাইল। ভাগীদার বলিল, "চল, এইবার বাণিজ্যে যাই।"

একদিকে বাড়ীর পরিপূর্ণ আকর্ষণ, অপর দিকে বণিকবংশের স্বাভাবিক উদ্যম-শীলতা ও বাণিজ্যের প্রতি নেশা,—সে স্থির করিল, কিছু দিনের জন্য তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে হইবে। মাতাকে অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া সে বিদায় প্রার্থনা করিল। মাতা পীরের সিন্নি তুলিয়া রাখিয়া বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে প্রাণ-প্রিয় পুত্রকে বিদায় দিলেন। আয়নার শত অনুরোধ ব্যর্থ হওয়ার পরে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"যদি মেঘ ডাকিতে শোন, তখন সারেঙকে ডিঙ্গার কাছি বাঁধিতে আদেশ করিও, আমার মাথা খাও, গভীর রাত্রে ডিঙ্গা চালাইও না; গাবর-ভাঙ্গরের রাজ্যে

যাইও না—তাহারা নরমাংস খায়। ছয় মাসের মধ্যে যদি তুমি ফিরিয়া না আস, তবে আমি গলায় দড়ি বাঁধিয়া মরিব।"

এবার যেন রৌদ্রের তাপে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে, জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল—তাহার পরে আর বৃষ্টির দেখা নাই। ঘোর উত্তাপে যেন জলস্থল দগ্ধ হইতে লাগিল; কালো কালো "হাঁড়িয়া মেঘ" কখন কখন গগন-মণ্ডল ছাইয়া ফেলে, তখন কৃষকেরা অদূরবর্ত্তী জলাগমের আশা করিয়া থাকে, কিন্তু সহসা ভীষণ ঝড় উঠিয়া সেই মেঘের পংক্তি উড়াইয়া লইয়া যায়—তুফানে ধরিত্রী কাঁপিয়া উঠে, নদী টলমল করিতে থাকে। মামুদ বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার পরে—এইরূপ ঝড় প্রায়ই হইতে লাগিল, মামুদের মাতার ও আয়নার বুক ভয়ে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ভেড়া-ময়নার গর্জ্জনশীল ঢেউগুলি যখন উন্মত্তের মত তটদেশে আছাড় খাইয়া পড়ে, তখন মামুদের বাড়ীর ক্ষুদ্র কয়েকটি প্রাণীর মনের অবস্থা যে কিরূপ হয় তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

একদা প্রাতে ছিন্ন কটিবাস ও অর্দ্ধনগ্ন দেহে, শুষ্কমুখে ভাগিদার ও দুই একটি মাঝি গৃহে ফিরিয়া জানাইল যে ভয়ানক দুর্য্যোগে তাহাদের ডিঙ্গি নদীতে ডুবিয়া গিয়াছে, বহুসংখ্যক মাঝি মারা গিয়াছে, মামুদকে পাওয়া যায় নাই। তাহারা চার পাঁচ দিন নদীতীরস্থ অনেক জায়গা খুঁজিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু মামুদের শব জলে ভাসিয়া উঠে নাই। কানাকানি ও অর্দ্ধস্ফুট বিলোপোক্তি দ্বারা যতই সংবাদটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা হইল, ততই মাতা ও আয়না-বিবির মন উতালা হইল এবং মামুদের মৃত্যুর ছায়া সেই গৃহে যেন

স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইল। মাতা পাথরে মাথা কুটিতে লাগিলেন, উন্মাদিনী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু আয়না একেবারে পাগল হইল এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া বনে-জঙ্গলে 'হায়' 'হায়' করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

এই তরুণ বয়স্কা রমণীর দুঃখ ও বিলাপ শুনিয়া এক সদাশয় কৃষক তাহাকে আশ্রয় দিল। তাহার সাত ছেলে মামুদকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার লইল—ইহারা নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে করিতে অবশেষে মৃতপ্রায় মামুদকে আবিষ্কার করিয়া বহু কষ্টে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া আসিল। সেই সজ্জনদের চেষ্টায় ও আয়নার প্রাণান্ত শুশ্রূষা ও তপস্যার ফলে মামুদ আরোগ্য লাভ করিল।

মামুদ সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিল—মাতা ও ভগ্নি তাহাকে ও বউকে পাইয়া যে আনন্দ পাইল, তাহা বলিবার নহে।

কিন্তু পাড়াপড়সীরা এই সুখের বাদী হইল; আয়না ছয় সাত মাস বনে বনে পাগল হইয়া কাহার আশ্রয়ে ছিল, সে যে তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? এ স্ত্রী লইয়া পল্লী-সমাজে ঘর করা চলে না, তাহারা মামুদকে স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া নূতন একটি মেয়েকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিল। চক্রান্ত করিয়া তাহারা আয়নাকে নির্ব্বাসিত করিল।

দৈবঘটনা এবং মনুষ্য এইভাবে এমন সুখের সংসারের ধ্বংস সাধন করিল।

মামুদ পাগলের মত হইয়া সমাজের বিচার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল—কিন্তু তথাপি আয়নার শোকে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল।

(৪) "কৈছনে যাওব যমুনা-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জকুটির॥"

এখন আর কোন আশা নাই, বনে বনে বৃক্ষের ফলমূল খাইয়া আয়না জীবন ধারণ করে। কোন দিন কিছু খায়—কোন দিন কিছুই খায় না। আর সে সাবলীল সুগন্ধি তৈল-নিষেবিত কৃষ্ণকুন্তল—মল্লিকা ও মালতীর মালা জড়িত হইয়া বেণীবদ্ধ হয় না। আর ঘুমুর ও নূপুরের বোলে মৃদু মধুর রণন্ শব্দে—পদ্মের মত পা দুখানি,—চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া গৃহাঙ্গিনায় ঘুড়িয়া বেড়ায় না;—শণের মত—পাটের মত চুল, বিবর্ণ মুখ ও কঙ্কালসার কৃশ দেহ দেখিয়া কে চিনিবে—এ সেই চাঁদ সদাগরের ভিটার সাঁজের প্রদীপ—আয়না। কেহ তাহার রূপ দেখিতে চোখ তুলিয়া চাহে না—জীবন-মৃত্যু তাহার কাছে সমতুল।

সেই পূর্ব্বাঞ্চলে—আসামের পাদদেশে করঙ্গিয়া শ্রেণীর বেদেরা বড় বড় নদীর জলে তাহাদের ডিঙ্গা চালাইয়া মস্লার বেসাতি করিয়া বেড়ায়। পুরুষেরা নৌকা বাহে এবং মেয়েরা জামা-জোড়া পরিয়া মাথায় ঝুটা মুক্তার মালা-খচিত টুপি বাঁকাভাবে রাখিয়া বেসাতির চুপড়ি কাখে লইয়া পল্লীতে পল্লীতে বিকি করিয়া বেড়ায়, তাহারা পথে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং কলরব করিয়া কথাবার্ত্তা বলে; যখন নৌকায় ফিরিয়া আসে—তখন টুকরী ও সুন্দর সুন্দর তাল-পাতার পাখা তৈরী করে। সরু তালপাতের সাহায্যে তাহারা পাখা ও টুকরীগুলি সজ্জিত করে। তাহারাই রান্নাবান্না প্রভৃতি গৃহ-কার্য্য করে। কখনও মনের আনন্দে বনের পাখীর মত গান

করে। সে গানের অর্থ বুঝা যায় না, কিন্তু তাহা কানে ভারি মিষ্টি লাগে। পুরুষেরা শুধু নৌকা বাহিয়া যায়—আর অবসরকালে পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়।

কিন্তু সজ্জন বলিতে যাহা বুঝায়, এই বেদেদের মধ্যে সেইরূপ চরিত্রের উপাদান যথেষ্ট আছে। পরের দুঃখে তাহারা বিগলিত হয়, প্রাণ দিয়া আর্ত্তের সেবা করে ও বিপন্নকে আশ্রয় দেয়।

নদীর তীরে উন্মাদিনী রমণীকে দেখিয়া তাহারা আদরে তাহাদের নৌকায় লইয়া আসিল। তাহার অসংলগ্ন, গভীর শোকার্ত্ত, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথার অন্তরালে তাহারা আয়নার দেবীমূর্ত্তি বুঝিতে পারিল। বেদিনীরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তাহার দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সেই যত্ন, সহানুভূতি ও আদরে যেন মৃততরু সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। আয়নার ভাঙ্গা কলিজা আর জোড়া লাগিবার কথা নহে। কিন্তু তাহাদের সাহচর্য্যে সে মৌনভাব ত্যাগ করিল, তাহাদের সঙ্গে কিছু কিছু কথাবার্ত্তা কহিত ও যখন মনের বেদনা বড় তীব্র হইত, তখন তাহাদের একজনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইত ও কতকটা সোয়াস্তি পাইত।

তিন বৎসর আয়না তাহাদের সঙ্গে ছিল। এই তিন বৎসরে আয়না বেদিনীর সঙ্গে থাকিয়া বেদিনী হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার ছিল শুভ্র সতীত্বের তেজ এবং দেহে ছিল পারসিকদের হোমাগ্নির মত পবিত্রতা, সে বেদিনীদের মত জামা ও জোড় পরিত,

তাহাদেরই মত কারুখচিত টুপি পরিয়া করঙ্গিয়াদের মত বেসাতি করিতে পল্লীতে পল্লীতে বাহির হইত।

তিন বৎসর পরে—ফুড়াময়না নদীর তীরস্থ 'চাঁদের ভিটা' পল্লীতে সেই ডিঙ্গি উপস্থিত হইল। সেই পল্লীর বাতাস গায় লাগাতে আয়নার সমস্ত দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে কোনমতে আর উদ্গত অশ্রু রোধ করিতে পারিল না। মনে হইল, তাহার দেহ যেন বেহেস্তের অগ্নিতে জ্বলিতেছে, তাহার তীব্র জ্বালায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু সে জ্বালায় বেহেস্তের আনন্দ-কণার অস্তিত্বও সে অনুভব করিল।

এই সেই চাঁদের ভিটা, একবার স্বামী দর্শনের সাধ সে কিছুতেই নিরোধ করিতে পারিল না। আয়না করঙ্গিয়াদের মত বেশভূষা করিয়া বেদিনী ছন্দে বেণী বাঁধিল। বেদিনী ছন্দে জামা-জোড়া পড়িল, চোখে ও ভ্রূতে কাজলের রেখা টানিল, কপালে 'সোনা কাঁচে'র টিপ পড়িল এবং বেসাতীর ঝুরি মাথায় করিয়া চিরপরিচিত পথে বেদেনীদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল।

সম-বেশ-পরিহিতা, সমবয়স্কা বেদিনীরা চলিয়াছে,—করঙ্গিয়া বেদিনীর বেশে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আয়না। তাহার খোঁপা এবার উঁচু করিয়া বাঁধা, গলে লহরে লহরে গুঞ্জার মালা, বেসাতির ঝুড়ি মাথায় —চাঁদের ভিটায় আসিয়া আয়নার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠিল। পা যে আর চলে না, চিরপরিচিত দাড়িম গাছটির শাখায় টিয়া পাখী বাসা বাঁধিয়াছে, এই ত সেই ঘর, যাহাতে আয়না তাহার কত সাধের গৃহস্থালী পাতিয়া ছিল। এই ত তাহার শয্যাগৃহ, তাহার এত

সাধের, এত তপস্যার স্বামী সেই ঘরে বসিয়া আছেন! আর সহ্য হইল না, চক্ষের জল বাধা মানিল না, কিন্তু ফুকারিয়া কাঁদিবার বেগ মুখে হাতে চাপিয়া দমন করিল, তাহার গণ্ডে অবিরত সঞ্চরিত অশ্রু,—যেন শত শত মুক্তা—তাহা দেখিবার কেহ নাই। কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল না, "কে তুমি কেন আসিয়াছ! তোমার প্রাণ-ফাটা দুঃখের কারণ কি?" আঙ্গিনায় মেন্দি গাছের ঝাড়,—এই মেন্দিগাছ যে সে নিজ হাতে পুতিয়া গিয়াছে। সেই ঘর, সেই দরজা—সেই আঙ্গিনা ত তাহার তেমনি আছে। সে রোজ কত যত্নে ঝাড়িয়া পুছিয়া বাড়ীখানি ঝলমল করিয়া রাখিত, হায় রে এখন এ বাড়ীতে তাহার আঙ্গুলটি রাখিবার উপযোগী এতটুকু স্থান নাই।

কত দুঃখের দুঃখিনী সে—তাহার সোয়ামী—তাহার কলিজার হাড়—সে সোয়ামী পর হইয়া গিয়াছে। তাহার স্থান অপরে লইয়াছে; এই সোনার ঘরে একটি শিশু-পুত্র খেলা করিতেছে। হামাগুঁড়ি দিয়া চারিদিকে যেন সোনা ছড়াইয়া সে খেলা করিতেছে; এই সুখের সংসারে দুষমণ আয়নার আজ স্থান কোথায়? সে বাবুই পাখীর মত ঘর থাকিতে বাহিরে বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। ঘর পর হইয়াছে, কোন্ দৈব তাহাকে এমন ভাবে হৃতসর্ব্বস্ব করিল? আল্লা তিনি তাহাকে কেন এত দুঃখ সহিতে সৃষ্টি করিলেন?

অসহ্য দুঃখে যখন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, তখন কে পিছন হইতে বলিল "কে গো তুমি, তোমার মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। অনেকদিনের কথা, তোমার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে আমার দুই চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, আমি তোমাকে

চিনিয়াছি। শাশুড়ির বিলাপ শুনিয়া চক্ষু মুছিয়া আয়না বলিল, "আমাকে তুমি কি করিয়া চিনিবে? আমি করঞ্জিয়া বেদিনী; মা তোমার মুখ ঠিক আমার মায়ের মুখের মত, এই জন্ম আমার বুক কাটিয়া কান্না বাহির হইতেছে। আমার সেই মা বড় স্নেহশীলা ছিলেন—আমার গায়ে ধূলা লাগিলে তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া নিজ হাতে তাহা মুছিয়া দিতেন; আমি কাঁদিলে তিনি ছুটিয়া আসিয়া আমায় কোলে নিতেন, আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িলে তিনি কত আদরে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতেন—আজ আমার কেউ নাই, পথে পড়িয়া মরিয়া গেলে একটু স্নেহ দেখাইবার কেহ নাই। আমার সেই মায়ের মুখের মত তোমার মুখ দেখিয়া দুঃখে চোখের জল থামাইতে পারিতেছিনা।"

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আয়না তাহার ভূপতিত বেসাতি পুনরায় মাথায় তুলিয়া লইল।

পিছনে পিছনে শাশুড়ী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন, "তুমি কি মা আমার আয়না? যদি হও, তবে তোমার ঘর, তোমার বাড়ীতে ফিরিয়া এস। তুমি যদি সত্যই আমার আয়না হও, তবে আমাকে এই দুস্তর শোক-সাগরে ফেলিয়া আর আমায় ছাড়িয়া যাইও না; তুমি যদি মা আমার আয়না হও, তবে আমার সমাজে কাজ নাই, আমি তোমায় বুকে করিয়া জঙ্গলে যাইয়া বাস করিব—ফিরিয়া এস আমার আয়না।"

এই ডাক শুনিয়া আয়না ফিরিয়া দাঁড়াইল, শাশুড়ী-ননদীর বিলাপ আর সহ্য করিতে পারিল না। বেসাতি মাথা হইতে ভূমিতে

ফেলিয়া দিল, খোঁপা খুলিয়া ফেলিল, লহরে লহরে বেণী পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া আয়নাকে চিনাইয়া দিল। ছুটিয়া যাইয়া সে নৌকায় উঠিল— "নৌকা ভাসাইয়া দেও, আমি অকূলের পথে চলিতেছি, এই চাঁদের ভিটায় আর আসিব না;—এখানে আপনার ধন পর হইয়া গিয়াছে। আপনার ঘর অপরে দখল করিয়াছে। এখানে আমার জন্য এক আঙ্গুল স্থানও নাই, আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি ?"

"চাঁদের ভিটার পাখীসব, তোমাদের কাকলী দ্বারা আমার আগমন বার্ত্তা তাহাকে দিও না; আমার বঁধুকে বলিও আমার জন্মের সাধ তাহার মুখখানি একবার দেখিয়া লইয়াছি। আমার জীবনের আর কোন কাজ নাই। তাহাকে বলিও, আমি দরিয়ায় ডুবিয়া মরিয়াছি। আমার সপত্নী সুখে থাকুক। তাহার বুকে মাথা রাখিয়া আমার স্বামী চিরায়ু হইয়া বাঁচিয়া থাকুন, আমার সপত্নীর ছেলেটি যেন চিরায়ু ও বিজয়ী বীর হয়, অভাগিনী তাহার স্বামীর মুখখানি দেখিয়াছে—এখন তাহার জীবন কৃতার্থ হইয়াছে।

আষাঢ়িয়া নদীর জল ভীষণ আবর্ত্ত লইয়া উন্মত্তবেগে ছুটিয়াছে। দুঃখিনী আয়না করঙ্গিয়ার বেশ ছাড়িয়া এলোচুল ছড়াইয়া তাহার স্রোতে নিজ দেহ ভাসাইয়া দিল।

"আষাঢ়িয়া তোরের নদী ঢেউএ ভাঙ্গা যায়।
কাঁচা সোনার তনু আয়না জলেতে মিশায়।

"আকাশ ইসারা করিয়া জানাইল এবং বাতাস মৃদুস্বরে মানুদের কানে কানে বলিল, "ও নারী করঙ্গিয়া নয়—বেদেনী নয়,

পুরাতনী

দুঃখিনী আয়না তোমাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল, পক্ষী নিজের বাসা খুঁজিতে আসিয়াছিল।

"সেই মুখ সেই চক্ষু,—সমস্ত অবয়ব সেইমত, অভাগী তোমাকে দেখিতে আসিয়াছিল। কেউত তাহাকে ডা জিজ্ঞাসা করিল না, দুঃখিনী-আয়না নিজের ঘরে প্রবেশ-পথ না • কাঁদিতে কাঁদিতে পলাইয়া নদীর জলে প্রাণ দিয়াছে। তে বাড়ীর নিবিড় আঁধার মুহূর্ত্তের জন্য সেই হারাণো মণির দী উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা আবার অন্ধকার হইয়াছে।

"(হায়) বাতাসে কয় কানে কানে আস্মানে কয় রৈয়া
আইল দুঃখিনী আয়না তোমারে খুঁজিয়া ॥
নয় সে কলঙ্কিয়া নারীরে নয় ত সে বাদিয়া।
এসেছিল দুঃখিনী আয়না তোমারে খুঁজিয়া ॥
পক্ষিনী আসিয়াছিল বাসতো খুঁজিয়া ॥
সেই মুখ সেই চোখ ভাল সেইত সকলরে।
এসেছিল অভাগিনী তোমায় দেখ্তে না রে ॥
কেউনা পুছিল তারে, কেউনা কহিল থাকরে।
জিঙ্খির মত আয়না গেল চোখে ধাঁধা দিয়ারে ॥"

হতভাগ্য মামুদ সেইদিন বাড়ী ছাড়িল, ফকিরী লইয়া কৈ বনে জঙ্গলে নদীর তীরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া অবশেসে জীবন কাটাইয়া দিল। চাঁদের ভিটার দীপ নিবিয়া গেল।

শেষ